মোহন রাকেশ (১৯২৫-৭২) সকলের প্রথমে গল্পকার, তার পর ঔপন্যাসিক এবং সবশেষে নাট্যকাররূপে হিন্দি সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি একজন দক্ষ প্রাবন্ধিক ও অনুবাদকও ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর লেখনী অতি বিশ্বস্তভাবে আপন সময়, সমাজ এবং পরিবেশের ছবি এঁকে গেছে।

নাটকের ক্ষেত্রেই মোহন রাকেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। নাটক যে তিনি অনেক লিখেছেন তা নয়, তবে 'আষাঢ় কা একদিন', 'লহরোঁ কে রাজহংস' এবং 'আধে আধুরে'-কে রচনাগুণে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। তাঁর প্রথম নাটক 'আষাঢ় কা একদিন' ১৯৫৯ সালে সংগীত নাটক অকাদেমির পুরস্কার লাভ করে।

ড. প্রতিভা অগ্রবাল রাকেশকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নানা প্রামাণিক দলিলদস্তাবেজের ভিত্তিতে প্রতিভা অগ্রবাল রাকেশের এই জীবনী রচনা করেছেন।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সত্যজিৎ রায়
মূল্য : ১৫ টাকা
ISBN 81-7201-448-1

মোহন রাকেশ

প্রতিভা অগ্রবাল

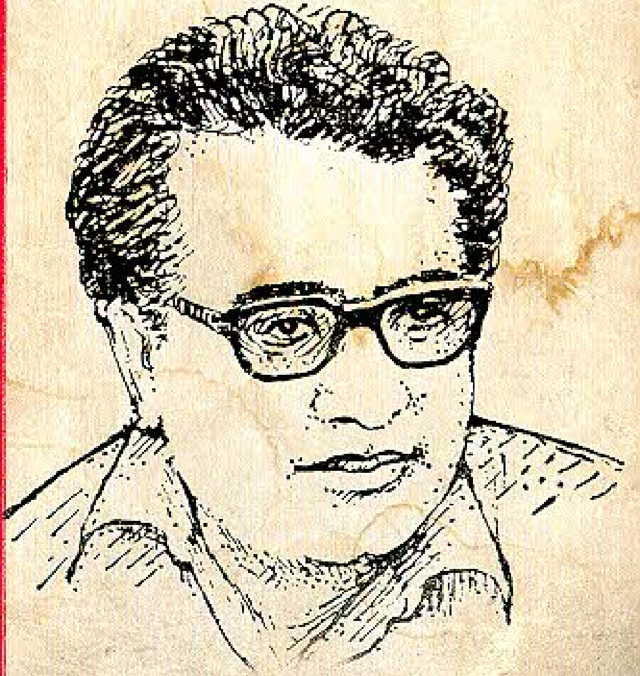

ভারতীয়
সাহিত্যকার
পুস্তকমালা

মোহন রাকেশ

এই পুস্তকের অন্তঃপ্রচ্ছদে আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। নাগার্জুনকোন্ডার এই ধ্বংসাবশেষ এখন নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এ রক্ষিত। এই ভাস্কর্যের বিষয়: রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় তিনজন জ্যোতিষী ভগবান বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। জ্যোতিষীদের আসনের তলায় বসে করণিক তাঁদের বক্তব্য লিখে চলেছেন। অনুমান এটি ভারতে লিখনকলার প্রাচীনতম চিত্ররূপ।

ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

মোহন রাকেশ

প্রতিভা অগ্রবাল

অনুবাদ

সুবিমল বসাক

সাহিত্য অকাদেমি

Mohan Rakesh: Bengali translation by Sri Subimal Basak of the same title in Hindi by Pratibha Agrawal, Sahitya Akademi, New Delhi, 1993. Price: Rs 15

© সাহিত্য অকাদেমি
81-7201-448-1

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
বিক্রয় কেন্দ্র :
স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

আঞ্চলিক কার্যালয়
জীবনতারা ভবন, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
গুণ ভবন, তৃতীয়তল, ৩০৪-৩০৫ আন্না সলাই, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮
১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪
এডিএ রঙ্গমন্দির, ১০৯ জে. সি. রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০২

মূল্য : ১৫ টাকা

মুদ্রক
ফ্রেণ্ডস্ গ্রাফিক্
১১ বি, বিডন রো
কলকাতা ৭০০ ০০৬

১৯৮৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি যখন মোহন রাকেশ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনার প্রস্তাব দেয়, আমি তা আনন্দে স্বীকার করি। নাট্যকার রাকেশের সঙ্গে বেশ ভাল পরিচিত ছিলাম, তাঁর 'আষাঢ় কা একদিন'-এ অম্বিকা এবং 'আধে অধূরে' তে সাবিত্রীর চরিত্রে অভিনয় করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলাম। ব্যক্তি রাকেশের সঙ্গেও বেশ কিছুটা পরিচয় ছিল, তাঁর জীবনের শেষ দশ-বারোটা বছর আমাদের সঙ্গে প্রায় দেখাসাক্ষাৎ ঘটত। তা সত্ত্বেও গল্পলেখক ঔপন্যাসিক এবং বুদ্ধিজীবী রাকেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহলে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের প্রকৃত রূপ যথার্থভাবে বুঝতে পারা ও আঁকতে পারা সম্ভব, তবেই তার প্রতি সুবিচার করা যায়। এই কাজ আমি নিষ্ঠাসহ পালন করেছি, পরিণাম স্বরূপ এই পুস্তিকা।

এই পুস্তিকাটি দুটি অংশে বিভক্ত—'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' এবং 'কৃতি ও কৃতিত্ব'। প্রথমাংশের মূল ভিত্তি হল তাঁর ডায়রী, 'ব-কমল খুদ' এর লেখা, স্ত্রী অনীতার গ্রন্থ 'চন্দ সতরেঁ ঔর' এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু কমলেশ্বরের 'মেরা হমদম মেরা দোস্ত' শিরোনামাযুক্ত লেখা। এই সকল প্রামাণিক দস্তাবেজের ভিত্তিতে আমি রাকেশের জীবনী ও ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছি। 'কৃতি ও কৃতিত্ব' অংশে তাঁর বহুমুখী সৃজন প্রতিভা ও সৃজন ক্ষমতার পরিচয় তথ্যসহ দিয়েছি, সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণও। এই পুস্তিকা নানান ভাষায় অনূদিত হয়ে মোহন রাকেশকে যদি দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। একজন প্রিয় শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যকারের প্রতি এই আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রতিভা অগ্রবাল

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

একটি রাত। তার এপার-ওপার দুই পৃথিবী। দুই পৃথিবীই আমার—আমার নিজের, নিজস্ব। আর তার মাঝে সেই একটি রাত—সেটাও আমার নিজেরই। আজও তা অতিক্রম করেনি।

সেই রাত, সারা রাত, ঘুম আসে নি। প্রথমে অন্ধকারে সিঁড়ির দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসে ছিলাম। তারপর বৈঠকখানায় তক্তপোষে উবু হয়ে পড়ে ছিলাম। তারপর জানালার গরাদ ঘেঁষে কালো আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছিলাম। আকাশের দিকে আগামী কালের অজানা গভীরতার দিকে।

কিছুক্ষণ আগে বাবার মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর মৃতদেহ মেঝের ওপর রাখা। সকাল অবধি পড়ে থাকার কথা। হয়তো সকালের পরেও। অন্ধকার দীর্ণ করে একটি কণ্ঠস্বর চমকে সতর্ক করে দেয়। কান্নার স্বর কে সহসা একযোগে থামিয়ে দেয়।

কণ্ঠস্বর বাড়িঅলার বড় ছেলের। বাজারে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে সে বলেছিল, "আমি মড়া তুলতে দেব না। যতক্ষণ না বাড়িভাড়া আদায় হবে, আমি কাউকে মড়ায় হাত দিতে দেব না!" কয়েক মাসের বাড়িভাড়া ক'বছর ধরে বাকী ছিল। এদিকে রোগে ছ-সাত মাসের ভাড়া তাতে আরও যোগ হয়েছিল।

সে ফিরে যায়, অন্ধকারে অনেকক্ষণ নৈঃশব্দ ছেয়ে থাকে। কেউই কাউকে কিছু বলার সাহস পায় না। কান্নাও নয়। যারা-যারা এসে জুটেছিল, এক-এক করে তারা সরে পড়ে।

কিন্তু সকালেই সে আবার ফিরে আসে। শবযাত্রায় কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। মার হাতের চুড়ি ততক্ষণে বিক্রি হয়ে গেছিল। বাড়ি ভাড়া শোধ হয়ে গেছিল।

কিন্তু সেই রাত, জানালার গরাদের পাশ দিয়ে, আকাশের গভীরতায় না জানি কত কিছু দেখে ফেলেছিলাম— সেই সব-যা ঘটে গিয়েছিল, যা ঘটছিল এবং যা ঘটতে যাচ্ছিল। অতীতকালের কত ছায়া-প্রতিচ্ছায়া ভবীকালের মোড়ে এসে জমা হয়েছিল। এবং ভবিষ্যতের সেই কাল ইলেক্ট্রিক তারে ও গাছের ডালে-ডালে বসে জোনাকীর মতো চমক দিয়ে যাচ্ছিল, কখনও বা নক্ষত্ররাজির মতো ঝলমল করে উঠছিল। কখনও সেই কাল গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল, পড়ে থাকছিল অতীত কালের ছায়ার ভিড়, যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিল।

শীতকালের রাত। শিকগুলি সাংঘাতিক ঠান্ডায় কনকনে। তবুও হাড়-কাঁপুনি হাতে শক্ত করে তা ধরে রেখেছিলাম।

এই মানসিক পরিস্থিতি ভোগকারী ব্যক্তি হল মদন মোহন গুগলানী, যে পরবর্তীকালে হিন্দি সাহিত্যে এবং ভারতীয় নাট্যজগতে **মোহন রাকেশ** নামে পরিচিত হয়। ঘটনা কাল বোধহয় ১৯৪০-৪১ রাকেশ তখন ষোল বছরের, সেই সময় পিতার মৃত্যুতে অকস্মাৎ মাথার ওপর পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। সহসা কিশোর থেকে সে যুবকে পরিণত হয়েছিল এবং পিতার মৃত্যুর দিনেই ষোল বছর বয়সে তাকে মা, ভাই ও বোনের পরিবারের রক্ষা করার আশ্বাস মাকে দিতে হয়েছিল। এই বিষয়ের বর্ণনা সে এভাবেই করেছিল —

"ফ্যাকাসে চেহারা রোগা-ধরণের ছেলে। মা, চিরপরিচিতা, তার থেকে আলাদা তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মাথার চুল খোলা। ঘোমটা নেই। গৃহে আটকে থাকার ফলে সঞ্চিত সর্বদা নত-নত ভাবও ছিল না। শবদাহের পরে উভয়েই শ্মশান থেকে ফিরে এসেছিল।

"তুই এবার থেকে আমার দেখাশোনা করবি ?"

ছেলেটি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কিছু বলতে পারে না।

মার ভাব-ভঙ্গিমা কঠোর হয়ে ওঠে। সে তার ছেলের কব্জি নিজের হাতে চেপে ধরে। 'করবি না ?'

ছেলেটি একবার কেঁপে মাথা নাড়ায়, 'করব।'

'ভাই-বোনের পালন করবি ?'

ছেলেটি ভাবতে থাকে। বোন তার চেয়ে দেড় বছরের বড়। তাকে সে কি ভাবে পালন করবে ?

'করবি না ?'

'করব।'

মা কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে তার কব্জি ধরে থাকে, তারপর তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে ওঠে।

কোনো বিকল্প ছিল না। ষোল বছর বয়সে জীবন তাকে একটা চৌকাঠের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যে ভাবেই হোক, নিজেকে সেই চৌকাঠের উপর খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।"

[পরিবেশ, পৃঃ ১৬]

ছেলেবেলার আরও অনেক ঘটনা রাকেশের স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল, যার বর্ণনা সে উপরিউক্ত রচনায় করেছে, অন্যত্রও করেছে।

রাকেশের জন্ম ৮ জানুয়ারী ১৯২৫ — অমৃতসরে চন্ডীবালী গলিতে। বাড়ির পেছনে যাযাবরদের বস্তি, যাদের নাচ-গান রাকেশকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করত, তার শিশুমন তাদের সঙ্গে নাচার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠত। কিন্তু ঠাকুমার কঠোর দৃষ্টিতে মনের ইচ্ছে ঠোঁট অবধি আসতে দিত না। যাযাবরেরা নিম্নশ্রেণীর লোক, তাদের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর আবার সম্পর্ক কিসের! তার বাড়ির পরিবেশ ও ঠাকুমার কথা রাকেশ সবিস্তারে বলেছে

"ঠাকুমার ঘরের ধোয়া ময়লা শাড়ি থেকে বিশেষ ধরণের গন্ধ বার হয় — ঘামের, মশলার, ফুলের, ঠাকুরের ভোগের। সেই গন্ধের আশ্রয়ে কারো কোন ভয় নেই—না চামচিকের, না ভূতের, না ডাইনীর — কোন ভয় নেই। ঠাকুমাকে ভূত-প্রেতরাও ভয় পায়। তার গালাগালের চোটে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আমাদের বাড়ি বাদ দিয়ে পাড়ার সব বাড়িতেই ভূত-প্রেত, যাযাবর, টিকটিকি, যাদুকরী, চামচিকে এবং সিদ্ধপুরুষ থাকে। ঠাকুমার সখীরা, সকলেই তুকতাক করে। প্রায়ই কারো-না-কারোকে অসুস্থ করে দেয়, আমার কানে যন্ত্রণা হলে, অথবা চোখ উঠলে, তার কারণ বেবুশ্যে গুরাঁদেই বা ভাতারখাগী চুগের মা দোরগোড়ায় লঙ্কা ফেলে গেছে। রাতে গলিতে কুকুর কাঁদতে শুরু করলে, বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। ঠাকুমা বলে, রাটী ফুলকৌর প্রেত জাগাচ্ছে। কিন্তু তাদের মাঝে কারো সঙ্গে তার ঝগড়া-বিবাদ ঘটলে, সেই রাতে সে-ই প্রেত জাগাতে শুরু করে। তার বাড়ির খাবার জিনিসে, এমন কি ফুলেও বিষ মেশানো থাকে। ঠাকুরের প্রসাদেও তারা কোনো-না-কোনো রোগের বীজানু মিশিয়ে দেয়।"

[পরিবেশে, পৃ ৪-৫]

একদিকে যেখানে এমন কুসংস্কারপূর্ণ এবং সংকীর্ণ পরিবেশ—যেখানে বালক মদন মোহনের দমবন্ধ হয়ে আসত, আবার অন্য দিকে উকিল পিতার ব্যক্তিত্ব, — যিনি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, যাঁর ঘরে ওকালতি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের বই আলমারি ভর্তি ছিল, যাঁর হাত ধরে সেতার এবং বেহালার সঙ্গে পরিচয় সেই শৈশবেই ঘটেছিল, যাঁর বন্ধুদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ অশক্ এর মতো প্রতিষ্ঠিত কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন — খুব কম বয়সে রাকেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে যা দৃঢ় মৈত্রী রূপে বিকশিত হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই বই রাকেশকে আকর্ষণ করত। যেহেতু বাজারের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা বারণ ছিল, সেহেতু সেই বালক ঘরের যাবতীয় বস্তুর দ্বারাই মনোরঞ্জন করত।

"আমি বইয়ের সঙ্গে খেলা করি। বাবার বৈঠকখানায় অসংখ্য বইয়ের আলমারি ভর্তি। আমি ওগুলোর সঙ্গে কানামাছি খেলি। ওদের আড়াআড়ি-বাঁকা ভাবে সাজিয়ে দুর্গ তৈরী করি। কোনো ভরী বই পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত করে, আমি রাগ করে তাকে আলমারির পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিই। যে বইয়ের সঙ্গে বেশি শত্রুতা, পুরনো আসবাবের বাক্সের ভেতর বন্ধ করে রাখি। সুযোগ বুঝে বাক্সের ভেতর উঁকি মেরে দাঁত কিড়মিড় করি—এই, এই, এই! শত্রুতা বেশি হলে, লাঠি দিয়ে মার দিই। পাতা ছিঁড়ে ফেলি। তারপর আবার সেই — 'এই, এই, এই!'

(পরিবেশ, পৃঃ ৭)

রাকেশের পরিবার পরম বৈষ্ণব পরিবার ছিল, ঠাকুমার ঠাকুর নিয়ে খেলার ইচ্ছে তার মনে বারবার হত, কিন্তু তেমন কোন প্রভাব তার মনে রেখাপাত করেনি, কারণ পরবর্তী জীবনে বা লেখায় ঐ জীবন-দৃষ্টির পরিচয় বা প্রভাব কোথাও দেখা দেয় নি। কাজের প্রতি তার নিষ্ঠা, নিজস্ব মতের প্রতি তার দৃঢ়তা, এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

প্রতি তার আস্থার শেকড় হয়তো শৈশবের সেইসব ধার্মিক সংস্কার এবং পরিবেশের গুণে হয়েছিল। বিশাল এক যৌথ পরিবারে পালিত বালক অনেক কিছু অনায়াসে জেনে ফেলে, সহজেই শিখে ফেলে। রাকেশের অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্র অবিরাম বিকশিত হতে থাকে, সেই সঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্নও মনে জাগে। মামা দেবীদয়ালের মৃত্যু সংবাদ শুনে বালক মদন মোহন তার শ্যাম কাকার পাশে খাটিয়ায় শুয়ে জিজ্ঞেস করে বসে — 'কা-কা, মৃত্যু কি?' শ্যাম কাকা বালকের জিজ্ঞাসার সমাধান সেইভাবেই করেন — যা সচরাচর লোকেরা করে থাকে। বালক আরেকটা প্রশ্ন করে বসে — 'মৃত্যুর পরে কি হয়?' এবং কাকার কাছ থেকে উত্তর পায়, 'মৃত্যুর পরে কিছু হয় না। মৃত্যুর পর লোকেরা শেষ হয়ে যায়।' বালক এই জবাবে সন্তুষ্ট হয় না — 'লোকেরা শেষ হয়ে যায়!' এও কোনো কথা হল নাকি! কাকা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। কিন্তু, কাকা ঠাট্টা করছিলেন না। মন অন্য কারোকে প্রশ্ন করতে চায় কিন্তু বালক কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। তখনই প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে বড় নির্মম প্রমাণ। হার্নিয়া অপারেশনের পর শ্যাম কাকার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং একদিন তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রাকেশ তাকে মৃত্যুর আগে কাছ থেকে দেখে। মনের ভেতর সব তছনছ হয়ে যায়। অন্ধকারে সে ভয় পায়, দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা দিতে থাকে। রাকেশ সেই সময়কার তার মানসিক অবস্থা, সেই সঙ্গে কিশোর-মনে অঙ্কুরিত ভাবনা খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছে —

"আমি অন্ধকারে ভয় পাই। দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখি। বাড়িতে, স্কুলে, যেখানে সেখানে যে কোন সময়ে। মাথা এক ধারে নুয়ে পড়ে। চোখ ভারী হয়ে ওঠে। কপালে শিরা দপ্‌দপ্‌ করে ফুলে ওঠে। হাতের স্লেট বা তক্তায় সোজা-বাঁকা রেখা ফুটে ওঠে। সামনের লোকটা একের বদলে দু-দুটো হয়ে ওঠে। শোনা আওয়াজের যথার্থ অর্থ লুপ্ত হয়ে যায়। শিক্ষক হয়তো কিছু বোঝাচ্ছেন অথচ মাঝখানে স্বপ্নে পিছলে পড়ি। মার্বেল পাথরের মেঝেতে ছড়ানো গোরচন এবং আরতির ঘণ্টা ধ্বনি .... গঙ্গার তীব্র বেগ এবং তার ওপর ভাসমান ছোট ছোট প্রদীপ....ঘাটে স্নানরতা যুবতির....ফর্সা, সুঠাম শরীর এবং ভেজা স্বচ্ছ সাড়ি....হোমের ধোঁয়া ও মন্ত্রোচ্চারণ....উন্মুক্ত দ্বার ও সুসজ্জিত মূর্তি....ধূপকাঠি থেকে বেরুনো ধোঁয়ার রেখা — উৎসবের ভিড়ে ধাক্কা খাওয়া আকৃতি সমূহ...বৃষ্টির জলে ভরা রাস্তা, উল্লাসে নৃত্যরত নগ্ন শিশুরা....শিশুদের বকুনি-গাল দিচ্ছে বৃদ্ধা পারো...' পারো গন্ডে-খানী। পারো গন্ডে-খানী...! ভাল করে আমায় জড়িয়ে চুমু খায় আমার চেয়ে দশ বছরের বড় মেয়ে ....খাতার ছেঁড়াপাতা.....রাতের বাতাসে ভেসে চলা গান....মোমবাতির গলন্ত মোম....কম্পমান ছায়া....রুটির গন্ধ এবং বাজারের মোড়ে বেনারসীর খসখস শব্দ....ছুরি দিয়ে দরজায় খোদা অক্ষর....ছাদে প্রসারিত রোদ আর ছড়ানো আখের খোসা......ছেঁড়া ঘুড়ির জন্য লালায়িত হাত.....'ভো কাট্টা। উল্‌লল্‌ কাট্টা!'.....কাঁচা পথ.....ক্লান্ত পা আর ঘুমে বুজে আসা চোখ...ইনক্লাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেয়া মিছিল....তরল অন্ধকারে বেহালার সুর....কাঁপা হাত, শুষ্ক ওষ্ঠ এবং শরীরে কামনার

প্রথম সূচনা......!"

[পরিবেশ, পৃঃ ১৩-১৪]

এই সময় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরস্পর সম্পর্ক, সেই সঙ্গে ব্যাকুল মন, অস্থির স্বভাব এবং অতিবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে পেন্ডুলামের মতো দোদুল্যমান নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রাকেশ সচেতন ছিল। অনেক কিছু সে ভাবতে শুরু করেছিল, অনুভব করতে শুরু করেছিল। এই প্রসঙ্গে সে পরে লিখেছে —

'বিগত সময়ের বাস্তব, আজকে স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়, আগামীকালের স্বপ্ন আজকের বাস্তব। বেঁচে থাকার কোনও মুহূর্ত একা এবং স্বতন্ত্র না থেকে সামনে পেছনের মুহূর্তে হারিয়ে থাকে। যা গত হয়, মন তাতে নিজের শেকড় ছড়িয়ে রাখে। যা অনাগত, তার দিকে তার শাখা-প্রশাখা কাঁপতে থাকে। জীবনের প্রতিটি দিবস বিগত দিবসের গর্ভ থেকে উদিত হয় — আগামীকালকে দ্রুত নিজের ভেতর থেকে প্রস্ফুটনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

এই ব্যাকুলতা, এই অস্থিরতা, স্বভাবে পরিণত হতে থাকে। যে কোনো মুহূর্ত আগত-মুহূর্তকে দ্রুত লাভ করার ইচ্ছায়, সহজ থাকতে পারে না। যেখানে আছ সেখান থেকে উঠে পড়, অন্য কোথাও এগিয়ে যাও। যা করছ, তা ফেলে রাখো, অন্য কিছু কর। বসলে, দু-তিন মিনিটে বারবার পাতা উলটে দেখে নাও, পরিচ্ছেদ কোথায় শেষ হচ্ছে। খেতে বসেছ, চার মিনিটে সবকিছু গিলে হাত ধুয়ে ফেলো। কাঁচের গেলাস হাত থেকে ফস্কে গেলে, মাটিতে পড়ার আগেই ধরে নাও সেটা ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে।

অস্থিরতা থেকে অতিবাদী প্রবৃত্তি আসতে থাকে, চা খাও, এত গরম—যাতে জিভ পুড়ে যায়। জল খাও, এত ঠান্ডা—যাতে গলায় ব্যথা হয়। হাসো, এমন করে যাতে মন উদাস হয়ে পড়ে। চুপ থাকো, এমন ভাবে—যাতে লোকেরা বিব্রত হয়ে পড়ে।"

(পরিবেশ, পৃঃ ১৪)

এবং উনিশ বছর বয়সেই রাকেশ বেশ বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিল — অস্থিরতা, অতিবাদিতা এবং আক্রোশ তার ব্যক্তিত্বে মিশে গিয়েছিল।

এবার মার কাহিনী, যাকে রাকেশ আম্মা বলে ডাকত এবং যিনি রাকেশের আম্মা হওয়ার দরুন তার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের আম্মা ছিলেন। আম্মা, প্রথম দিকে যৌথ পরিবারের সুখ দুঃখ সহ্য করেন, পরে রাকেশের সঙ্গে থেকে তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, তারই মাঝে ভাগাভাগি করে তাঁর জীবন কাটান। প্রথম জীবন আর্থিক কষ্টে কাটে, পাওনাদারদের তাগাদার কথা রাকেশ উল্লেখ করেছে। তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কেমন অজুহাত তৈরী করা, তাও তার লেখনী থেকে জানা যায়। পিতার মৃত্যুর পর বাড়িঅলা বকেয়া ভাড়া শোধ না করতে পারলে শবদেহ তুলতে দেবে না বলে

ভয় দেখানোর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। মার হাতের সোনার চুড়ি বিক্রি করে ভাড়া শোধ করা হয়েছিল। তারপরে দীর্ঘকাল বাড়ির অবস্থা ভাল হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। জানি না, মা তার তিন-তিনটে সন্তান নিয়ে কি ভাবে দিন কাটিয়েছে। এর মাঝে কখনও ভাল করে না খাওয়া হয়েছে, না নতুন কাপড় পরতে পেরেছে। সচরাচর রাকেশের পুরনো জামা কেটে তিনি নিজের জামা সেলাই করে নিতেন। রাকেশ আপত্তি করত। কিন্তু তাতে আর কি হত! সংসার কি ভাবে চালাতে হয়, তা তিনি ভালো করে জানতেন।

রাকেশ এক জায়গায় লিখেছে, আম্মা কেবল দিতে জানে, নিতে জানে না। মায়ের প্রতি রাকেশের গভীর টান ছিল, অপরিমিত শ্রদ্ধা এবং অটুট বিশ্বাস ছিল। ২.৯.৫৮-এর ডায়রীতে রাকেশ তার মার সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছে তাতে মায়ের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাকেশের ব্যক্তিত্বের প্রতিও আলোকপাত হয় — তার সংবেদনশীল মনে ফুটে ওঠে —

অদ্যাবধি আমার জীবনে সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় যার পেয়েছি, তিনি হলেন আমার মা।

এটা উচ্ছ্বাস নয়। আমি বহুবার নিরপেক্ষভাবে এই নারীকে বুঝবার চেষ্টা করেছি, এবং প্রতিবার আমার ক্ষুদ্রতা আমাকে লজ্জিত করেছে।

অনেক বড় বড় দুঃখে আমি তাঁকে অবিচল ধৈর্যে স্থির থাকতে দেখেছি। জীবনের কোন পরিস্থিতি তাঁকে কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে সরাতে পারেনি। কিন্তু, তাঁর কর্মণ্যতার জন্য বিন্দুমাত্র অহংভাব তাঁর মাঝে নেই। তিনি কর্ম করেন, যেন কর্ম তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর জীবন, তাঁর স্বভাব। তিনি যা করতে পারতেন না, তার দুঃখ তাঁর মনে অবশ্যই হত, কিন্তু যা পারতেন তাঁর জন্য অহঙ্কার ছিল না।

বাড়িতে তাঁর অস্তিত্ব কিছুটা সেরকমই যেমন পৃথিবীতে বায়ুর অস্তিত্ব—সে প্রাণ দেয়, কিন্তু নিজে অদৃশ্য থাকে। বাড়িতে সব কিছু সাজানো গোছানো থাকে -সব জিনিস সুব্যবস্থিত থাকে — কিন্তু, মা কিছু করার জন্য সেই সময়টা বাছেন, যখন 'সেই করাটা' কারো চোখে যেন ধরা না পড়ে। কাল রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি আমার টেবিল ঝাড়পোছ গোছগাছ করছিলেন। আমি তাঁর ওপর রেগে উঠি, তিনি কিন্তু আমার রাগে দুঃখী না হয়ে বরং স্নেহশীল হয়ে ওঠেন।

'তুই তো আমাকে কোন কাজই করতে দিস না। সকালে তোর টেবিলে জিনিসপত্তর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকলে তোর আর বসে কাজ করার ইচ্ছেই করবে না।'

আমি রাগ করতে থাকি, আর তিনি আমার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

'মার বোকামীর ওপর রাগ করতে নেই। তুই ত জানিস, তোর মা মন থেকে কোন খারাপ কিছু করতে চায় না। যদি কোন ভুলচুক হয়, তাহলে

মন খারাপ করিসনা। আয়, তোর মাথায় তেল মেখে দিই। সারাদিন কাজ করিস, খুব পরিশ্রম হয়, নারে?'

বুঝতে পারি না, এই নারীর জীবন কি শুধু শরীর-নির্ভর, নাকি তার অতিরিক্ত কিছু। নিজের শারীরিক দুঃখ, শ্রান্তি, রোগ সব কিছু তাঁর কাছে মহত্বহীন মনে হয়।

বহুবার অভাবে পড়েছি। বাবার মৃত্যুর পর খুব খারাপ সময় কেটেছে। তারপর, মাঝে দু-তিনবার বেকার অবস্থায় কাটিয়েছি। তা সত্বেও মা সামান্যতম উপকরণ দিয়ে সেই রুটি আমায় থালায় দিয়ে গেছে। অনেক কাট-ছাট হত — প্রথমে তাঁর নিজের শরীর আর পেটের থেকে, তারপর দিদির শাড়ি-পোশাক ও খাবারে, তারপর ছোট ভাইয়ের বরাদ্দ থেকে — কিন্তু আমার ভাগ থেকে নয়।

এর কারণ হল আর্থিক। কেননা, 'তুমি হলে বড় ছেলে এবং তারা তোমার ওপর নির্ভর করে আছে।' এমন কথাও শুনেছি। সত্যি কি এর কারণ আর্থিক? তিনি কি আমার ওপর নির্ভর করেন? তাঁর রাতদিনের তপস্যা কি আর্থিক নির্ভরতা?

'মা, তুমি অন্নপূর্ণা।' একবার আমি বলেছিলাম।

তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। খুব সরল ভাবে তিনি জিজ্ঞেস করে ছিলেন, হ্যাঁরে, কি জন্য তুই এমন কথা বলিস?....তোর বাবাও একবার একথা বলেছিল।....কিসের জন্য?....'

'আমার বিবাহিত জীবনে তুমি দু-তরফা অত্যাচার সহ্য করেছ। ওদিকে তার কাছে থেকে একজন ঝি-দাসীর মতো ব্যবহার সহ্য করেছ। আর এদিকে আমার কাছে এসে আমার যন্ত্রণা আর ছটফটানি দেখেছ। তা সত্বেও তুমি নিজে থেকে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কখনও মুখ থেকে বার করনি। আর এখন শেষ সময়ে তোমার সঙ্গে কৃত ব্যবহারের কথা যদিও বা বললে, তাও আমাকে নয়, কৌশল্যা বৌদিকে বললে।

'আমি বলেছিলাম, আমার ছেলে এমনিতেই দুঃখী, আমি ওকে দুখী করবো কেন?'

শীলা! এই নারীর সম্পর্কে বলত 'তাঁর মনে সাংঘাতিক Inferiority complex আছে। আমার শুধু এটুকুই দোষ, আমি তোমার মায়ের মতো Inferiority complex এর শিকার নই।'

সেই Inferiority complex এর শিকারগ্রস্তা নারী এসময়েও তাঁর ঘরে আলো জ্বালিয়ে শুয়ে আছেন—ঘুমোন নি—যদিও আজ সারাদিন কাজকর্ম করেছেন—ক্ষণকাল তরেও বিশ্রাম করতে পারেন নি। কারণটা আমার জানা। আমি এখনও ইসবগুলের ভূষি খাইনি।

এই সাড়ে চার ফুট শরীরে ভাবনার অতিরিক্ত আরও কিছু আছে।'

আম্মার সম্পর্কে অনীতার (রাকেশের তৃতীয় স্ত্রী) কথাগুলো দ্রষ্টব্য—

"আমাদের দুজনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে....আম্মার সঙ্গে থাকলে আমরা দুজনেই সাহস পাব, শক্তি পাব— একটা শক্ত ভিৎ—একটা গৃহ তৈরী করার জন্য। রাকেশ এই কথাটা স্বীকার করে নিয়েছে। দুজনের মন চাইছিল না আম্মাকে ছেড়ে চলে যেতে। কি সুন্দর লাগে মা'র উনুন ধরানো, তার ওপর ফুটন্ত ডাল.....ফুলকো রুটি। তারপর আম্মার দু-ধারে বসে টাটকা-গরম রুটি খাওয়া, একটা-আধটা রুটি নিয়ে খুনসুটি করা'— আর আম্মার ন্যায়-বিচারে বিশ্বাস করা ....সব কিছুই কি সুন্দর না লাগত। আম্মা এত পরিচ্ছন্ন ও নির্মল ছিলেন.....যা চেয়ে দেখার মতো। মনে হতো, কেউ যতই অসম্ভব বা দুর্লভ হোক না কেন, এখানে এসে তার পরিবর্তন হতে পারে। তিনি যে শুধু প্রেরণাদায়ী ছিলেন তা নয়, বরং শক্তিও জোগাতেন.....সকলেরই —তাঁকে দরকার পড়ত। আর আমি! আমি তো ভিখিরি ছিলাম....পথে-পথে মেগে বেড়াতাম....."

[চন্দ সতঁরে ঔর, পৃঃ ৮০-৮১]

১৯৪৭ সালের দুটি ঘটনা রাকেশকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। প্রথম ঘটনা ভারত বিভাজন, এবং দ্বিতীয় ঘটনা দিদির মৃত্যু। 'প্রথম ঘটনা তাকে পরিবেশ থেকে উপড়ে ফেলে দেয়, দ্বিতীয়টি উপড়ে ফেলার বোধকে আরও গভীর করে তোলে।'

[পরিবেশ, পৃঃ ২২]

বাইশ বছর বয়সেই ছেলে প্রবীণ হয়ে ওঠে।

'কিন্তু ততদিনে সে পথ খুঁজে পেতে শুরু করে — সে সব কাগজে যার অনেক বান্ডিল পরেও পোড়ানো হয় এবং নষ্ট করা হতে থাকে।'

[পরিবেশ, পৃঃ ২২]

ভারত ভাগ হবার পর রাকেশের জীবন-ধারায় নতুন মোড় দেখা যায়। থাকার নিশ্চিত স্থান (শহর) শুধু হারিয়েছে তাই নয় বরং জীবনের ভিতই নড়ে ওঠে। কোথাও টিঁকে থাকা কঠিন মনে হতে থাকে। এই ঘোরাঘুরি স্থূলভাবে 'শহর' ও 'গৃহ' মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং সূক্ষ্ম ভাবে তা 'মন' এর স্তরেও। লাহোর ত্যাগ করার পর, পরবর্তী দশ বছর সে যোধপুর, বোম্বাই, জলন্ধর, সিমলা, আবার জলন্ধর প্রভৃতি শহরে কাটায়। তবে, জীবনের শেষ দশ বছর সে দিল্লীতে থাকে, কিন্তু নিয়মিত বাড়ি পাল্টানো চলে। সেই সঙ্গে অনবরত ভ্রমণও চলতে থাকে। কোথাও জমিয়ে বসা রাকেশের পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল। উপরিউক্ত শহর ছাড়াও ডালহৌসী, ধরমশালা কুলু, এলাহাবাদ, লসকর, কলকাতা ইত্যাদি শহরেও তার যাত্রা অব্যাহত ছিল। সম্ভবত এ তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা, যা তাঁকে কখনও কোথাও এক নাগাড়ে টিকতে দেয় নি। হৃদয়ের ব্যাকুলতা একটা স্থায়ী গৃহের অন্বেষণ তার মাঝে সর্বদা জাগরূক ছিল। সে তিনটে বিয়ে করেছে, দুটো বিধিমাফিক, তৃতীয়টি গান্ধর্ব মতে। প্রথম দুটি বিয়েই অসফল হয়। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান — ছেলে নবনীত, যাকে আদর করে

রাকেশ নীত বা নীতে বলে ডাকত। তার গল্প 'এক ঔর জিন্দগী'—নিজেকে নিয়ে, প্রথমা স্ত্রী শীলা ও ছেলে নবনীতকে কেন্দ্র করে রচিত। মন্নু ভান্ডারীর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'আপকা বাণ্টি'র ভিত্তিও রাকেশের প্রথম বিবাহ এবং নবনীতের সমস্যা নিয়ে। বিয়ের কিছু দিন পরেই শীলার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে থাকে, এবং দীর্ঘ কথাবার্তা ও ঝামেলার পর এই সম্পর্কের অবসান ঘটে ১৯৫৭ সালে—রাকেশ তখন বত্রিশ বছরের তরুণ। ছেলের প্রতি গভীর স্নেহ ছিল, তাকে ছাড়তে কষ্ট হয়। ১২ আগষ্ট ১৯৫৭ এর ডায়রীতে রাকেশ ১১ এবং ১২ আগষ্টের ঘটনাবলি, সেই সঙ্গে নিজের মানসিক অবস্থার মর্মান্তিক বর্ণনা করেছে—

ডালহৌসী: ১২.৮.৫৭

তন্দ্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় বাসে চেপে যাত্রা করি। সাড়ে আট-নটা নাগাদ ডালহৌসীতে গিয়ে পৌঁছাই। অশক্ ততদিনে শীলার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফেলেছিলেন। তালাকে'র মুসাবিদা নিয়ে তিনি আবার সন্ধ্যা অবধি কথাবার্তা বলেন—রাত পর্যন্ত আবার আমাদের তিনজনের মধ্যে এবং শীলার সঙ্গে আমার একান্তে কথাবার্তা হয়। স্থির হয়, পরদিন সকালে পাঁচটার বাসে আমরা রওনা দেব — সেখানে গিয়ে কাগজপত্র তৈরি করে রাখব — অশক্ শীলার সঙ্গে ন'টার বাসে রওনা হয়ে একটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছবে।

পাঠানকোটে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে থাকি। আদালতে গিয়ে স্ট্যাম্প পেপার কিনে, মুসাবিদা টাইপ করাই, অশক্ এবং শীলাকে রিসীভ করে তাদের হোটেলে নিয়ে যাই, সেখানে স্নান-খোয়া সেরে, কিছুক্ষণ নীতের সঙ্গে খেলাধুলো করি। কাগজে শীলা হস্তাক্ষর দেয়ার সময় নীত তার হাত ধরে বাধা দিতে থাকে। সোমেশ ওকে ধরে কাঁদতে শুরু করে। ঠিক সে সময় একটা পাখি, ইলেক্ট্রিক ফ্যানের আঘাত খেয়ে তক্তপোষের ওপর এসে পড়ে। আমি কিছুই দেখছিলাম না, শুধু মগজে কয়েকটা কথা পাক খাচ্ছিল —

'হায়-হায় পাখিটা মরে গেছে!'

'পাখি নয়, পাখির বাচ্চা।'

'না, না, এটা পাখিই!'

'মরে নি, শুধু একটু লেগেছে।'

'ওটাকে তুলে এক পাশে সরিয়ে রেখে দাও।'

'এদিকে রেখো না, ছেলেটা ওকে থেঁৎলে দেবে!'

'না, না, কখনও তা করবে না, ও তফাতে থাকবে!'

'বাইরে বার করে দাও।'

'থাক না পড়ে, কি বলছ?'

তালাক-পত্রে সকলের সই হয়ে যেতে, সকালে বেরিয়ে কোর্টের দিকে এগিয়ে যাই। শীলা সামনে ছিল, ভাল লাগছিল না, ওর পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিই। আদালতে গিয়ে জানা গেল, রেজিস্ট্রেশনের সময় পার হয়ে গেছে।

তহসীলদার এই সময় রেজিষ্ট্রেশন করতে প্রস্তুত নয়। তহসীলদার তখন ক্যাশ-এ ছিল। লোহার-গরাদের দরজা বন্ধ হতে দেখা যাচ্ছিল। সকলেই খুব উদ্বিগ্ন, কি হবে-কি হবে!

একসময় তহসীলদার বেরিয়ে আসে। শীলা তার কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করে, সে আগ্রা থেকে এসেছে, থাকতে পারবে না, পরদিন রাখীবন্ধন, তারপর রবিবার, তাই সেদিনই 'রেজেস্ট্রিশান' করে নেয়া হক। তহসীলদার মাথা নাড়ায়, ক্লার্ক রুমে নিয়ে গিয়ে এন্ট্রি করে, তারপর কোর্টে হাজির হয়। জনৈক উকিল তখন কেস আর্গু করছিল —'হুজুর, এ কি করে দোষী হতে পারে? বয়ানে ও বলেছে, জানে না কে এসেছিল, অথচ এখানে বলছে এই লোকটাই এসেছিল—তাহলে, কি করে এর কথায় বিশ্বাস করা চলে....তাছাড়া দুজন স্ত্রীলোকের চেয়ে কি এই পুরুষটি .....সবল? চেহারায় কি একে ডাকাত-ডাকাত মনে হয়?'

.....আরগুমেন্টের মাঝপথেই তহসীলদার মাথা তোলে, 'মদন মোহন কে ?'

'আমি।'

'যা এতে লেখা আছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'শীলা দেবী কে?'

'আমি!'

'সব ঠিক এখানে?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

তহসীলদার মাথা নীচু করে সই করতে থাকে, বলে — 'যাও।'

কাশ্মীর-মেলে শীলা ফিরে যায়। মন দারুণ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হোটেলে ফিরে আসা পর্যন্ত দারুণ ভাবে ডিপ্রেশান ছেয়ে যায়।

রাত্রে অশক্ জনৈক কমরেডের সামনে কম্যুনিস্ট পার্টির হেনস্থা করতে থাকে।

ডালহৌসী ফিরে এসেও দুদিন ডিপ্রেশান ছেয়ে থাকে। কোনো কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না। কয়েকটা চিঠি লিখলাম, এদিক-সেদিক বেড়ালাম, প্রতিদিন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তাম, কথা বলতাম, হাসি-হৈচৈ করতাম, কিন্তু .....কিন্তু মনের ভার দূর হয় না।

[ডায়রী, ১২.৮.৫৭, পৃঃ ১০৫-৬]

এই সম্পর্ক-বিচ্ছেদ রাকেশকে গভীর ভাবে ভেঙে ফেলেছিল। এর ফলে তার লেখায় শিথিলতা নেমে আসে। এরই মাঝে বন্ধু-বান্ধবের বৃত্ত ছড়িয়ে পড়ে — সাহিত্যিক এবং সাহিত্যেতর সম্পর্ক। উপেন্দ্র নাথ অশক্ এবং কৌশল্যা ছিলই; রাজবেদী, কমলেশ্বর, গায়ত্রী বৌদি, রাজেন্দ্র যাদব, মন্নু ভাণ্ডারী, চমন, জওহর চৌধুরী, ওমপ্রকাশ, শীলা সন্ধু, ধর্মবীর ভারতী, পুষ্পা ভারতী, শ্যামানন্দ জালান, বাসু ভট্টাচার্য এবং রিঙ্কী ভট্টাচার্য ইত্যাদি-ইত্যাদি। এছাড়া অসংখ্য মেয়ে যারা তার চারদিকে ঘুরে বেড়াত, যাদের মাঝে কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্টতাও হয়েছিল। রাকেশের ডায়রীর একটা বৃহৎ অংশ এই মহিলা

বান্ধবী (বা, যুবতী বান্ধবীদের) সম্পর্কে লিখিত। একজনের সঙ্গে বিয়ে করার কথাও এগিয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবরূপ নিতে পারেনি।

আবার একটা আঘাত। আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের আগ্রহ পুনর্বিবাহের পক্ষে। রাকেশের মনও দারুণ শূন্যতা অনুভব করছিল তাই পুষ্পার সঙ্গে বিবাহ করে ফেলে—একেবারে আলাদা ধরনের মহিলা—সামান্য লেখাপড়া জানা, সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে। কিন্তু রাকেশ তার সঙ্গেও সংসার করতে পারল না। অবিরাম টেনশান, অবসাদ, একাকীত্ব বোধ।

'আজকের দিনটা ভয়ঙ্কর উদাস করা দিন — এমন ঔদাস্য যা ভেতরে-ভেতরে আমাকে খেয়ে চলেছে। এই ঔদাস্যের স্রোত আমার জানা। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে আমি যে ভুল করেছি, এসব তারই পরিণাম।

'প্রথমাবস্থা থেকে আমি কোনোরকমে মুক্ত হয়ে এসেছিলাম। ছেলের বিচ্ছেদ আমার কাছে বেশ কষ্টদায়ক ছিল, কেননা আমার যাবতীয় বিবেক ও অনাসক্তি সত্ত্বেও আমি ওকে খুব ভালবাসি।'

কিন্তু, দ্বিতীয় বৈবাহিক প্রয়োগ পিঠে ছোরার ঘা বলে প্রমাণিত হয় — ঘাতক সাধারণ হলেও, ফালা-ফালা করে দেয়ার মতো। প্রথমা স্ত্রী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী — কিন্তু তার মাঝে কোমলতার অভাব ছিল—বাণীর কোমলতা, ব্যবহারে কোমলতা। এবং অভাব ছিল প্রেমের। আমার খুব কষ্ট হত। এই মহিলার মাঝে না সেই শিক্ষা আছে, না বুদ্ধি আছে। আছে কেবল পাঞ্জাবের একটা ছোট শহরের নিম্ন মধ্যবিত্তের দীনতা। একজনের কাছ থেকে বালি ও পাথরের অনুভূতি হত, অন্যজনের কাছ থেকে আবর্জনা আর নালার জলের অনুভূতি । অথচ এতেই আশা নিহিত আছে। একজন পুরুষ আর্বজনা পরিষ্কার করতে পারে, নালার জল ফিল্টার করতে পারে, কিন্তু বালিকে আটায় পরিবর্তিত করতে পারে না। তাই, পুষ্পার তরফ থেকে আমি এখনও নিরাশ হইনি। তবে, তার হিস্টিরিয়া আমাকে গভীর হিস্টিরিয়ায় পৌঁছে দিয়েছে। এই হিস্টিরিয়া যেন ছোঁয়াচে রোগ।

এই নতুন অভিজ্ঞতার তিক্ততা আমার পক্ষে ঘাতক হতে পারত, কিন্তু একটা ব্যাপার আমায় রক্ষা করেছে। তা হল আমার সৃজনক্ষমতা। এবার শুধু তার উপস্থিতি নয়, বরং বলা চলে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। যদিও এমনটা ঘটেছে বিশুদ্ধ পরিবর্তনের ভাবনায় বা বিশুদ্ধ উদাসীনতায় বা শুধুমাত্র জীবিত থাকার ইচ্ছায়।' [ডায়রী, পৃঃ ২৩০-৩১]

কিন্তু, রাকেশ সেই আবর্জনা পরিষ্কার করতে পারেনি, অপরিষ্কার জলও পরিশোধন করতে পারেনি। জীবন সেভাবেই এগিয়ে চলতে থাকে—বিরক্তি, আক্রোশ, রাগ, উদাসীনতা, অবসাদ, হতাশায় মজ্জিত। সৃজন অবিরাম ঘটতে থাকে, সেই সঙ্গে মনে মনে মন্থন। রাকেশের অধিকাংশ রচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। গল্প—অধিকাংশ একাকীত্বের গল্প, অসফল দাম্পত্যের কাহিনী, ভঙ্গুর-বিশৃঙ্খল পরিবেশ এবং সম্পর্কের গল্প। সফল প্রেম, সুখী দাম্পত্য, আনন্দময় সম্পর্কের আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম—তা গল্পই হক, উপন্যাস হক, বা নাটক হক। রাকেশ বারবার তার জীবনকেই তার রচনায়

চিত্রিত করেছে, নিজস্ব ভাবনা তার অঙ্কিত চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। 'আষাঢ় কা একদিন'-এর কালিদাস, এবং 'লহরো কে রাজহংস'-এর নন্দ নানান রূপে, নানান স্তরে ব্যক্তি ও সাহিত্যিক রাকেশের জীবন এবং মান্যতা মুখরিত করে।

এরই মাঝে তার গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, তার সংকলন গ্রন্থ বার হয়, উপন্যাস বার হয়, ভ্রমণ, স্মৃতিকথা এবং প্রবন্ধ সংগ্রহ বার হয়। ১৯৫৮ সালে রাকেশ 'আষাঢ় কা একদিন' সম্পূর্ণ করে, ১৯৫৯ সালে সঙ্গীত নাটক অকাদমি কর্তৃক নাট্যরচনায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এই রাজকীয় সম্মান রাকেশ কে নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। খুব কম লেখকেরই প্রথম রচনা এমন গৌরবের অধিকারী হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে এরি মাঝে দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে তার তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। তার প্রতি উদাসীনতা মনে বাসা বাঁধে। ঠিক অকস্মাৎ পরিচয় ঘটে অনীতা ঔলকের সঙ্গে। পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে অনিতার মায়ের মাধ্যমে, কিন্তু ধীরে ধীরে রাকেশ ও অনীতা কাছাকাছি হয়। মার কঠিন দৃষ্টি এবং জবরদস্ত আপত্তি সত্ত্বেও এক-অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। একদিন (২২ জুলাই ১৯৬৩) চুপচাপ তারা দুজনে একটা বন্ধ ঘরে (রাকেশের বাড়িতে) মালা বদল করে, এক অপরকে মিষ্টি মুখ করিয়ে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে। কারণ পুষ্পা কোনো অবস্থায় ডিভোর্স দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই এই বিবাহ আইন-সঙ্গত হতে পারে না, কিন্তু তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না রাকেশ। অনীতাও। এই গন্ধর্ব বিবাহের কথা কেবল দুজন জানত—আম্মা এবং কমলেশ্বর। অনীতার বাড়ির লোকেরা অনবরত সন্দেহে দিন কাটাতে থাকে। তারা শীঘ্র অনীতার বিয়েও স্থির করে। এরই মাঝে একদিন রাকেশের ওপর ছোরা নিয়ে হামলা হয়—কে জানে, কে এই কুকর্ম করিয়েছিল। কিন্তু, এরপর দিল্লীতে থাকা নিরাপদ ছিলনা, বিয়ের তিন চারদিন পরে তারা দুজনে চুপচাপ বোম্বাই পালিয়ে যায়। অনীতা ততদিনে ২১ বছরেরও হয়নি। আগষ্টে তা পূর্ণ হবে। বোম্বাইয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা তাদের টেনে নেয়। কয়েকদিন বোম্বাইয়ে থাকে। কিন্তু ছ'মাসের ভেতর রাকেশ ও অনীতার মাঝে টেনশন শুরু হয়ে যায়।

'চন্দ সতরেঁ ঔর'-এ অনিতা লিখেছে—

'রাকেশের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ছ'মাস হয়ে গেছে কিন্তু, এই ছ'মাস আমরা দুজনে পরস্পরের কাছে আরও অপরিচিত হয়ে উঠেছি। যদিও এটা আলাদা ব্যাপার, যে রূপকে আমরা একে অপরের মাঝে পেয়েছি তা আমাদের দুজনের মধ্যে কারো প্রয়োজন ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলাম আমি আনন্দের খোঁজে....কিন্তু কি নিয়তি! কি বিড়ম্বনা! রাকেশ তার ব্যক্তিগত জীবনে—লেখা, বন্ধু এবং স্ত্রীর সম্পর্কে এতখানি নিশ্চিত ছিল, তার প্রমাণ হলো এই সব পংক্তি—

'আমার জীবনে প্রথম স্থান আমার লেখা-লেখি, দ্বিতীয় স্থানে আমার বন্ধু-বান্ধব এবং তৃতীয় স্থানে তুমি—কিন্তু তিনটিই আমার কাছে প্রয়োজনীয়—এটা ধ্রুব সত্য।'

সেই সঙ্গে, এও বলেছিল সে—

তুই আমার রেকর্ড খারাপ করে দিয়েছিস। দু বছরের বেশী আমি কোন নারীর সঙ্গে বাস করিনি। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে, দু তিন বছরের পর চলে যাবি। কিন্তু ছ বছর পার হয়ে গেছে, তোর যাওয়ার কোনো গরজ চোখে পড়ছে না।'

ভালবেসে বলা এই কথা—ধীরে ধীরে সংযত এবং স্থির জীবনের ইঙ্গিত করে। যে গৃহের খোঁজ ছিল রাকেশের, তা সম্ভবত ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। এক মেয়ে পুরবা এবং এক ছেলে শালীন গৃহকে পূর্ণ করে তোলে, গৃহের সংজ্ঞা সার্থক করে।

রাকেশ কিন্তু দারুণ প্রাণোচ্ছল এবং সবার প্রিয় মানুষ ছিল। তার বন্ধু বান্ধবের বিশাল পরিধি যা দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, জলন্ধর ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে ছিল এবং রাকেশের সন্ধ্যা (রাত ১-২ পর্যন্ত ধরা যায়) তাদের জন্য তোলা থাকত। বন্ধুদের সঙ্গে কফিহাউসে জমায়েত হতো, বসে আড্ডা মারা, রাত্রে কোনো হোটেল-রেস্তরাঁয় বা নিজের বাড়িতে বা অন্যকারো বাড়িতে বসে মদ্যপান করা বা করানো, উচ্চগ্রামে হাসা, নিজেদের মধ্যে পেছনে লাগা ইত্যাদি প্রতিদিনের দিনচর্যায় অভিন্ন অঙ্গ ছিল। একদিকে রাকেশ যেমন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ভাবুক প্রকৃতির, অন্যদিকে কঠোর ও বাস্তব। কারো কথায় যদি সে গলে যেত, তাহলে সীমা ছাড়িয়েও তার সাহায্য করত, তাকে নড়ানো যেত না। তাকে খুব উদার এবং সমঝোতা-কারী মনে হত, আবার কোথাও রুক্ষ ব্যাবহারিক এবং দৃঢ়।

কমলেশ্বর তার 'মেরা হমদম মেরা দোস্ত' পুস্তকে রাকেশের সম্পর্কে লিখেছে—

"কয়েকটা আদালতে, যেখানে আমার এই দারুণ প্রিয় বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। অনেক অপরাধ যাতে এই বন্ধু অপরাধী, এবং অপরাধ দারুণ সঙ্গীন.....প্রথম অপরাধ, রাকেশ কোথাও টেঁকে না, দ্বিতীয়ত সে যদি বা টেঁকে, উঠতে চায় না। সে চায় যে পৃথিবীসুদ্ধ সবাই স্রেফ তার জন্য ভাবুক এবং তার জন্য ব্যস্ত হক... সে শুধু এই চায় যে সকলের অসুবিধে সে নিজেই তুলে নেয়, এবং তার সম্পর্কে কোনো কথা যেন না ওঠে। সে লোকেদের বিরক্ত করার জন্য তার পেছু নেয়। এবং তার হাসিতে বিষ আছে.....সে আপন মনে দারুণ উৎফুল্ল এবং এমন মন-উজাড় করা সশব্দে হেসে ওঠে, যা শত্রুকেও বন্ধু করে তোলে!.... সে কিন্তু দারুণ লেখে..তবে লোক তেমন ভাল নয়...।

তারপর সে লিখেছে—

রাকেশ অপরের ভুল শেষ-সীমা পর্যন্ত বরদাস্ত করে। কিন্তু সহনশক্তির সীমা ভেঙে পড়লে সে যা উচিৎ তাই করে, তাতে জেদের শেষ সীমা অবধি জুড়ে থাকে। তার জেদকে তর্কের জালে অর্থহীন প্রমাণিত করা হয়, তখন তার কাছে শেষ অস্ত্র—ডিয়ার, এখন আর ভাল লাগছে না। এ এমন এক সরল জেদ যে এর সামনে কারো কিছু বলার থাকে না।'

(পৃ:৮)

এই রচনায় কমলেশ্বর আরও কয়েকটা কথা বলেছে, যা রাকেশের ব্যক্তিত্বে আলোকপাত করে—

'সে দুঃখ পান করতে জানে এবং তা একা সহ্য করার মত সমুদ্র-ক্ষমতা রাখে।
(পৃ:৩)

'সে বাড়ির ঐ ঠিকানা পায়নি, যা জীবনে এক নতুন এবং সুস্থ অর্থপ্রদান করে, যা মানুষ মৃত্যুপর্যন্ত নিজস্ব মনে করে বেঁচে থাকে, যার জন্য মৃত্যুর সঙ্গেও যুদ্ধ করে এবং নানান অসুবিধে সত্ত্বেও সে সুখে থাকে।'
(পৃ:৬)

'যেহেতু রাকেশ কৃত্রিম ভাবে থাকতে অভ্যস্ত নয়। তাই সে অসম্পূর্ণ জীবন বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করে না। সে টাকাপয়সা, মানসিকতা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পূর্ণ তৎপরতা ও সচেতন ভাবে থাকার আকাঙ্খী। সে মানুষের মমতা, আন্তরিকতা এবং সম্পর্ক দিন দিন ওজন করেনা, এমনকি নিজেও ওজন করার জন্য প্রস্তুত হয়না।
(পৃ:১১)

এমনই ছিল রাকেশ—বন্ধুদের প্রিয় বন্ধু। স্বয়ং রাকেশ তার ডায়রীতে যে ভাবনা প্রকাশ করেছে, তাতে তার ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, জীবন, লেখালেখি, প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে। তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

'যে ভাবে 'সেলার'-এ মদ কয়েক বছর ধরে mature হয়, সে ভাবে ছোট ছোট ঘটনা কয়েক বছর ধরে মস্তিষ্কে mature হয়। সেগুলি লিপিবদ্ধ করার সময় পুরনো মদের মতো নেশা উপভোগ হয়।'
(২২.৭.৫৭)

'যে ব্যক্তি শাশ্বত জীবনের চর্চা করে,সে এটা জানে না যে শাশ্বত জীবনের অর্থ হল নতুন কুঁড়ি প্রস্ফুটিত না হওয়া, নতুন অঙ্কুর উদগম না হওয়া, নতুন শিশুর জন্ম না নেয়া। যে ব্যক্তি এমন জীবন কামনা করে সে মৃত্যু-পূজারী। জীবনের শক্তি ও আকর্ষণ নতুনের সৃষ্টিতে এবং সে সৃষ্টি পূর্বাপেক্ষা পুরাতনের বিনাশ। বিনাশ দেখে আমাদের আশান্বিত হওয়া উচিৎ, নাকি নিরাশা? মৃত্যুকালীন ব্যক্তিকে আমরা সহানুভূতি জানাব, ঐ দেখো তোমার পেছনে দুটি ছোট ছোট দুরন্ত হাত তার স্থান নিতে চলেছে.....কেননা বিনাশের একটা মহান উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্যে হল নতুন সৃষ্টির জন্য স্থান ছেড়ে দেয়া। শুধু ছেড়ে দেয়াই নয়, বরং নতুন সৃষ্টির জন্য তাকে 'সার' হয়ে যাওয়া।
[১৩.৬.৫৩)

এই অনুভূতি, আমরা যে জীবিত, কেমন সুড়সুড়ি লাগে। জীবিত থাকার অনুভূতিতে সুখ আছে—এই সুখ বিভিন্ন সম্পর্কে রূপ পাল্টে পাল্টে ব্যক্ত হয়। তাছাড়া জীবিত থাকার অনুভূতি শুধু ব্যক্তির মাঝেই সীমিত থাকে না, নিজের বাইরে প্রতিটি বস্তুর স্পন্দনে, তার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতায় সেই জীবিত থাকার ভাব ব্যপ্ত থাকে। মনে হয় আমার জীবিত আছি কেননা, পরস্পরের প্রতিটি বস্তু জীবিত আছে—গাছপালা, ঘাস মাটি।'
(২৮.৭.৫৭)

'স্পষ্টবাদিতাকে মাঝে মাঝে সস্তা মনে করা হয়। অনেক সময় আমি অতি স্পষ্টবাদী হয়ে পড়ি, যা আমার হওয়া উচিত নয়।

'কাল আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করছি, এবং কালকেই এটা স্থির হয়ে যাওয়া উচিত, যে আমি বর্তমান পদে আরও কাজ করব, নাকি করব না!
(১.১০.৫৭)

'জীবনের সার্থকতা এতেই নিহিত, যে পরাজয়ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য ততখানি প্রেরণা দেয়, যতটা জয় দিতে পারে।'

'আমি জীবনকে ভালবাসি।'

'আমি যাদের ভালবাসি তারা জীবনের প্রতীক।'

'ব্যক্তি তোমাকে প্রতারণা করতে পারে কিন্তু জীবন কদাপি নয়।'
(৩০.১১.৫৭)

আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, অপরের কাছে তোমার জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি নিজে যা, তাই হওয়ার চেষ্টা করো। কোনো লোক তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে পেতে পারে না, তুমিও কাউকে সম্পূর্ণ ভাবে পেতে পার না। প্রতিটি লোক একটি পণ্যভরা বাজার। তা থেকে তুমি সেটাই তুলে নাও, যা তোমার পক্ষে সুন্দর ও উপযোগী, এবং যা নেয়ার সামর্থ্য তোমার মাঝে আছে, যা তোমাকে চুরি করে, বা কেড়ে বা ভিক্ষে করে নিতে হবে না। এটা চিন্তা করো না, যে শেষ পণ্য কোথায় যায়। কেই বা নেয়। এ ভাবে যে কোনো ব্যক্তি, সে স্বামীর সংজ্ঞা পাক না কেন, তোমার সব কিছু পাবে, এই কামনা করো না। যতখানি তার চাহিদা এবং যা তোমার দিতে আপত্তি নেই, ওকে তা দিয়ে দাও। তার পরেও যদি অন্যত্র দিতে পার তাহলে সেখানে দিয়ে দাও। না দিতে পারলেও খেদ করো না। কেননা বস্তুর মূল্য ক্রেতার শক্তির ওপর নির্ভর করে না। তার বাস্তবিক মূল্য তাতেই নিহিত থাকে। বাইরে থেকে একটা আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তার চিন্তা করো না। নিজের অন্তর্নিহিত মূল্য সার্থকতার অনুভব করো। এই ব্যাপারে অবশ্য ভারাক্রান্ত হয়ো না যে, একটি লোক তোমাকে চিনতে পারবে বলে তোমার আশা ছিল। সেই একজন তোমাকে চিনতে পারেনি, কেন? সে নিজের সামর্থ্য অনুসারে যতটা চিনতে পারবে, যতজনকে শ্রদ্ধা করতে পারবে, যতজনকে ভালবাসতে পারবে, তাকে হেসে ততটা হাসি উপহার দাও। শেষাবধি যদি আঁচলে বাধা থাকে—কোথাও ব্যবহৃত হয় না, কারো দ্বারা চেনা যায়না, তবুও মনে খেদ করো না। সে তোমারই সম্পত্তি, তোমাকে গরিমা দেয়ার জন্য আছে। সেই গরিমা অনুভব করো, বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁচে থাক। তখন এই অসার্থকতার অনুভূতি থাকবে না।'
(৭.১.৫৮)

'অনেক রাত পর্যন্ত নরেন্দ্রর সঙ্গে আমি নিজের সম্পর্কে আলোচনা করি। সত্যি কি আলাদা ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে?.....কোন কাজ হবেনা?'

'বেশ মন দিয়ে উৎসাহে কাজ করো হে পন্ডিত! আসলে এটা একটা মিশন—আর

তুমি চেয়েছিলে একে সফল করতে। এখন পিছিয়ে পড়ছ কেন?'

'এগিয়ে চলো, যা সামনে আসে তার মোকাবিলা করো। পিছিয়ে এসো না, কারণ জীবন খুবই ছোট—তোমার কাছে শুধু কয়েকটা বছর বেঁচে থাকার জন্য আছে।'

'যাও, প্রবাহের মাঝে নিজেকে ছেড়ে দাও। রাজনীতি বা পেশাগত জীবন কাটিও না, বেঁচে থাকো এক বাস্তব জীবন নিয়ে। পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শক্তি নিয়ে বাঁচো—শক্তি, যা তোমার ভেতরেই আছে, বাইরে কোথাও নয়।'

(৪.৫.৫৮)

'আমি খুশী ছিলাম এবং নিজের প্রতি সহজও। আমার দৃঢ় ধারণা—এমন এক ব্যক্তি যার উপর কারো নির্ভর করা উচিত বা যার উপর কেউ নির্ভর করতে পারে—সে স্বয়ং নিজে। অন্যরা তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হতে পারে, কিন্তু তারা ততটা বুঝতে পারবে না যতটা তুমি স্বয়ং নিজেকে বুঝতে পারো। তারা তাদের নির্ণয়ে হয়তো আরো বেশী ভারসাম্য হতে পারে, কিন্তু তারা কখনও তোমার সমস্যাকে ততখানি বুঝতে পারবে না—যতটা তুমি নিজে বুঝতে পারো।'

(২৪.৫,৫৮)

'আজ অধিকাংশ মূল্যায়ণের কথা সেই সব লোকেদের বলতে দেখা যায়, যাদের নিজেদেরই কোন মূল্যের প্রতি আস্থা নেই—যাদের কাছে মূল্য স্রেফ একটা শব্দ রূপে পরিচিত—এবং নিজের সরলতা বা ধূর্ততায় যারা তা থেকেই সার্থকতা পেতে চায়।'

(৬.৮.৬৪)

'সেই 'মুহূর্ত' যখন মানুষ কিছুই করতে পরে না, কিছুই ভাবতে পারে না, কিছুই চাইতে পারে না, যখন নিজেকে থেমে থাকা মনে হয়—বহমান জলে থেকেও ঘন শ্যাওলায় জড়িয়ে থাকা মনে হয়। যখন আত্মশক্তির ওপর নিজের আয়ত্ত থাকে না—যখন গতি থাকে না, প্রবাহ থাকে না, কেবল একটা কাঁপুনি থাকে—কাঁপুনি.....'

'একাকীত্ব! একটা অভিশাপও হতে পারে, একটা আকাঙ্খাও, আবর্তনও হতে পারে, প্রত্যাবর্তনও। বিচ্ছিন্নও হতে পারে, যুক্ত থাকার অন্তরালও।'

'ব্যক্তি অনিবার্যরূপে একা, হ্যাঁ—একা। কিন্তু এই একাকীত্ব যে অসামাজিক বা সমাজবিরোধীই হবে, এমন নয়। সামাজিক হওয়াতেই তো একাকীত্বের বোধ আছে, তা থেকেই একাকীত্বর প্রয়োজনও। নিজের একা থাকার জন্য একাকীত্ব জেল থানায় পেতে পারে—কিন্তু সেই একাকীত্ব কতখানি যন্ত্রণাদায়ক। যে একাকীত্ব মানুষ স্বয়ং নিজের জন্য বেছে নেয়, এবং চায়, সে তার একা থাকার জন্য হয় না—অনেকের মাঝে থাকার দরুণ, অনেকের মাঝে সৃষ্ট তার একা হওয়ার প্রচেষ্টা অনেকের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক-সূত্রেই উৎসারিত—এবং এই জন্যই বলা হয়েছে যে, সে সম্পর্ক-সূত্র থেকে মুক্ত নয়।

'একাকীত্বর প্রয়োজন অনুভূত হয় এজন্য যাতে দোকা হওয়ার নির্দিষ্ট ভূমি প্রস্তুত হয়। যে একাকীত্ব একা থাকার সীমারেখায় আটকে যায় তাতো মৃত্যুরই সামিল। বেঁচে

থাকার শুরুই একাকীত্ব থেকে, তা দ্বিতীয় ব্যক্তি কাছে হলেও। তবে, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন, নাকি কয়েক সহস্র—তা অবশ্য আলাদা ব্যাপার।'

(৮.৮.৬৪)

'জানি এটা খুবই সামান্য ব্যাপার। খুবই সাধারণ। একটা স্বাভাবিক টেনশান থাকে স্নায়ুতে, যা নর ও নারী মাংসপিন্ড পরস্পরের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকে। অপরের মাঝে মিশে যেতে, ডুবে যেতে বাধ্য করে ফেলে। গোটা প্রক্রিয়ায় একটা যান্ত্রিক ব্যাপার দেখা যায়। যেন একটার পর আরেকটা যন্ত্রাংশ সময় মত শুরু করে—টেলিগ্রাফ অফিসে টেবুলেটারের মত। সব কিছুই ঠিক, তবুও সেই মুহূর্তে যে বিবশতা, যে বিস্মৃতি, যে অবসাদ হয়, তা কি? হোক না তা কয়েক মুহূর্তের, একটা দিশা ও কাল-নিরপেক্ষ অনুভূতির স্পর্শ কেন হয়? কেনই বা সেই হুঁ হাঁ এবং নিষ্পেষণের মাঝে এমন জায়গায় এসে পড়ে যেখানে মনে হয় সামনে আকাশ রূপ সর্বকালিকতা আছে এবং আমরা নিজের মস্তঘাতে ভেঙে দিয়ে তার শেষ স্তর অবধি পৌঁছে যেতে চাই? এবং সেই অনুভূতি চেতনায় জাগ্রত হবার আগেই কেনইবা বিলীন হয়ে যায়? তারপর শেষ হয় নিষ্পেষন, তা থেকে শীঘ্রাতিশীঘ্র মুক্তি পাবার কামনা। হাত কাপড় খুঁজতে থাকে—নগ্নতায় নিজেকে জন্তু বলে মনে হয়।....কিন্তু সেই জন্তুর মতো নগ্নতাও কোন কোন অবস্থায় অদ্ভুত মনে হয়।

(১৬.৮.৬৪)

'তিনদিন ধরে কিছু না করার ক্লান্তি এবং বিরক্তি। টেবিলের উপর গল্প রেখে অসহায় ভাবে বসে টাইপরাইটারের কী-বোর্ড এর দিকে চেয়ে দেখছি। চোখের ফোকাস্ ঠিকানা থাকার ফলে কী-বোর্ডের তলার জাল বেশ বড় দেখাচ্ছে....মনে হল, যেন খুব গভীর 'ইটারনিটি'তে কোথাও উঁকি মেরে দেখছি....কী-বোর্ডের চার পংক্তি, চার থেকে পাঁচ হয়.....তারপর ছয়-সাত হয়ে পড়ে....তারপর আলাদা-আলাদা কীজ পংক্তি থেকে সরে গিয়ে উঁচু নীচু দেখা যেতে থাকে.....'

'মনে হল, দর্শকের পারসপেক্টিভ বাস্তব কে অনেকখানি পালটে দিতে পারে...। এমন কি অসীম গগনে উকিঁ মেরে যে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলতা চোখে পড়ে, তা পৃথিবী থেকে দেখার পারসপেক্টিভের দোষ নয়?'

(৯.৯.৬৪)

"আলোচনা" কর্তৃক আয়োজিত আচার্য হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি মহোৎসব। হাইলাইট — আচার্যদেবের মিথক সম্পর্কে বক্তৃতা। 'সর্বনাম' থেকে শুরু করে সাধারণ মানব সম্পর্কিত দৃষ্টি। বাস্তবিক দ্রষ্টা হলেন আচার্য দ্বিবেদী, কত সূক্ষ্ম ব্যাপার তিনি কি ভাবে হেসে সহজ ভাবে বললেন। কত গভীর সাক্ষাৎকার তার জীবনের সূক্ষ্মতার সঙ্গে।

(১.১০.৬৭)

'আজ শ্যামানন্দের সঙ্গে কথাবার্তার পর স্থির হয়, নতুন নাটকের প্রস্তুতিকরণের আগে কলকাতায় গিয়ে থাকব না। নিজের তরফ থেকে অনেকটা এগিয়ে নিজেরই মূল্য দেয়া পরামর্শের অর্থ অপরের কাছে পৌঁছে একেবারে ভিন্ন হয়ে পড়ে। এই

অতিরিক্ত উৎসাহও একধরণের হুজুগ, যা থেকে নিজেকে বাঁচানো জরুরী। নিজেকে স্ব-কেন্দ্রে রাখা উচিৎ, দৃষ্টি এটাই থাকা দরকার। ব্যক্তির মনও এতেই থাকে, এবং সে কাজও এভাবেই করতে পারে। অপরের কেন্দ্রে গেলে কাজ তো হয়ই না, এমন কি সেই মানও থাকে না... বিশেষ করে প্রস্তাব যদি নিজের তরফ থেকে ওঠে।

(২০.১০.৬৭)

ডায়রীর উপরিউক্ত বিস্তৃত অংশ এই উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করেছি যাতে রাকেশের অর্ন্তমনের অতিরিক্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, লেখার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে যা কিছু প্রকাশ করে, তা সীমিত হয়, তা ডায়রী হোক না কেন-! রাকেশকে জানার জন্য, বোঝার জন্য তার বন্ধু-বান্ধব এবং তার কাছে-পিঠের অন্যান্যারা তাঁর সম্পর্কে কি ভাবত, সেটা জানাও দরকার। তার প্রিয় বন্ধু কমলেশ্বরের মতামত উদ্ধৃতি করা হয়েছে, যা বস্তুত তার অন্যান্য বন্ধুর মতো। এবার প্রস্তুত অনীতার বিশ্লেষণ, সে সবচেয়ে দীর্ঘসময় স্ত্রী রূপে তার সঙ্গে বাস করেছে, এবং খানিকটা বয়সের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও অনেকখানি প্রেম ও শান্তি দিয়েছে, তাকে কাছ থেকে দেখেছে ও বুঝেছে, সুখ-দুঃখ, বহু মুহূর্ত একসঙ্গে ভোগ করেছে, সহ্য করেছে—

'বাইরে থেকে রাকেশকে যত সোজা ও সরল মনে হতো, বাস্তবে সে তা ছিল না। তাকে ভেতর অবধি ভাল করে বোঝা একটা বিরাট তপস্যা। বাইরে থেকে যতখানি ইনফরমাল, মন থেকে ততখানি ফর্মাল। যে সব বন্ধুদের সঙ্গে সে অত্যন্ত ইনফরমাল থেকেছে, তারা তাকে এর চেয়ে বেশী জানতে পারেনি। যারা কাছাকাছি ছিল, তারাও তার চেয়ে বেশী জানতে পারেনি— কেননা রাকেশ শুধু নিজের জন্য কোথাও পূর্ণ ছিল। আমি মাঝে মাঝে তার আলাদা-আলাদা ধরণের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বলে, 'প্রতিটি মানুষের এক নিজস্ব ধরনের ক্ষুধা থাকে। আমি প্রতিটি বন্ধুর কাছে আলাদা-আলাদা ভাবে উপস্থাপিত হই—প্রতিটি মানুষকে একই লেবেলে নেওয়া যায় না।' বস্তুত, একথা সত্যি। সে তার প্রতিটি বন্ধুর ভাল ও দুর্বল পক্ষ সম্পর্কে ভাল ভাবে জানত। তার বক্তব্য হলো—প্রতিটি ব্যক্তি তার ভাল পক্ষের সঙ্গে, কেবল নিজের দূর্বলতার সমন্বয়ে পূর্ণ হয়—কেননা আমরা কোন ব্যক্তিকে কেবল তার ভাল'র সঙ্গেই স্বীকার করতে পারি না— সেই ব্যক্তির ভেতরের দুর্বলতার সঙ্গেও আমি তাকে প্রিয় বন্ধু বলে ভাবি—তাকে ভালবাসি। আন্দাজ করে দেখো, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু ভালোয় ভরা হয়, তাহলে তাকে কতখানি পোজিং মনে হতে পারে।'

এই ব্যাপারটা সত্যি। সে তার ভিন্ন-ভিন্ন বন্ধুদের কাছে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হত—যদিও প্রকৃত রাকেশ সে ছিল না। নিজের কাছে রাকেশ ছিল একেবারে আলাদা, সৎব্যক্তি। সে ভাবেই সে নিজে-নিজেকে আয়নার দেখত এবং খুশী হত। তার ভাল লাগত সেভাবে নিজেকে আয়নায় দেখতে—কেননা সে তাই ছিল।'

[চন্দ সতরেঁ ঔর, পৃ: ৮৬]

সেই লোকটাকে বাইরে যতখানি ইনফর্মাল মনে হত—মন থেকে সে ততখানি ফর্মাল ছিল। তাই থেকে সরে এসে ইদানিং ঐ ব্যাপারটাকে পালন করার প্রোগ্রাম প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। তার বক্তব্য ছিল যে, এখন বেশী কাজ এবং পালন

করা কম অ্যাফর্ড করতে পারি—প্রথম প্রথম তার এই খন্ডিত প্রকৃতিতে আমি বেশ 'কনফিউজড' থাকতাম কিন্তু ধীরে ধীরে ওকে আরও জানা, ভাল করে জানার সুযোগ পেতে থাকি। একদিকে সেই লোকটা স্পষ্টবাদী ছিল, আবার তা বরদাস্ত করার সামর্থ্য বেশ ছিল। এরকম বহু সময় আমি তার সাথে কাটিয়েছি। এই দ্বিধাখন্ডিত প্রকৃতির কারণেই সে কখনও কাউকে তার বাড়িতে এসে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়নি—তাতে ওর স্বাধীনতায় বেশ বাধা পড়তো। সে লোকদের সঙ্গে যত সুখ ভাগ করে নিয়েছে তত দুঃখ ভাগ করেনি। জীবনকে সে আলাদা আলাদা ভাবে যাপন এবং ভোগ করেছে, কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বসে খুব কম আলোচনা করেছে আত্ম-করুণায় তার ঘৃণা ছিল, এজন্য যেখানে গিয়েছে যার সঙ্গে বসেছে, সে উত্তরোত্তর সচকিত হাসি অপরকে বিলিয়েছে।

বিগত দিনের ওপর তার বিশ্বাস ছিল না। তার আস্থা ছিল স্রেফ আগামী দিনের। যা পার হয়ে গেছে,তা শেষ হয়ে গেছে, এবং যা আসবে তারই প্রতীক্ষা করা।

[ঐ, পৃ:৯৮]

শুধু ব্যবহারেই নয়, রাকেশ তার লেখাতেও দারুণ সৎ ছিল। কম লেখার অনেকগুলি কারণ তার ছিল—প্রথমত জীবনে অস্থিরতা—তারপর, আর্থিক সঙ্কটের ফলে যে কোনো চাকরি করা (সবগুলি সে সততার সঙ্গে পালন করেছে) এবং সবচেয়ে বেশী মহত্বপূর্ণ ব্যাপার তার, 'সেল্ফ রিজেকশান'। 'স্যাহ সন্দে', 'কাঁপতা হুয়া দরিয়া', 'পৈর তলে কী জমীন' এর ছ-সাতটা খসড়া আছে। যদি তার কাছে পর্যাপ্ত সময় হতো, তাহলে হয়তো এখনও সেগুলো নিশ্চিত পরিমার্জনা করত। নিজের কৃতি নিয়ে জবরদস্ত ধৈর্য ছিল তার মাঝে। নিজের লেখার মানদন্ড তার কাছে এটা ছিল না যে, পাঠকরা কতখানি তা পছন্দ করেছে বা স্বীকার করেছে। তার মানদন্ড তার নিজস্ব সততাই ছিল।

তাছাড়াও আরেকটা অভ্যাস ছিল। দিন কয়েক বাইরে যাবার ফলে বা শরীর খারাপ থাকার দরুণ যে কাজ শেষ করে উঠতে পারত না। পরে সেই ফেলে রাখা জায়গা থেকে লেখা আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতনা—আবার তাকে সেই প্রথম পাতা থেকেই শুরু করতে হত। এই সব কারণে তার লেখালিখি খুব কম হতো।

এই সঙ্গে রাকেশ একজন দক্ষ পলিটিশিয়ানও ছিল। 'নতুন গল্প আন্দোলন' এবং 'থিয়েটার মুভমেন্ট'—এই ব্যাপারের প্রমান। সে যখনই তীর নিক্ষেপ করেছে তা উচিত নিশানায় বিঁধেছে। লক্ষ্যহীন গুলি চালানোয় তার বিশ্বাস ছিল না। হৈ-চৈ বাঁধিয়ে জনসাধারণের দৌড়ঝাঁপ করার এক আলাদা আনন্দ পেত। এ কারণে তার নিক্ষেপিত তীরে আহত যোদ্ধা চলে যাওয়ার পরেও, আজও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। [ঐ, পৃ: ৯৯]

তার দ্বিধাখন্ডিত ব্যক্তিত্ব কে দুই ভাগে খুবই সুক্ষ্ম ভাবে বিচার করা যেতে পারে—এক দিকে 'হাইলী ইনটেলেকচুআল লেবেল' ছিল, এবং অন্যদিকে 'হাইলী ইমোশনাল লেবেল।' এই দুটি লেভেলই সে দারুণ ভাবে রক্ষা করছে। কখনও এই দুটোয় কমপ্রোমাইজ হয় নি। এই দুই এক্সট্রিম সমস্যায় বেঁচে থাকা সেই লোকটা আলাদা ধরনের ব্যক্তি ছিল।

(ঐ, পৃ:১০১)

উপরিউক্ত অংশ রাকেশের ব্যক্তিত্বের সেই অংশকে তুলে ধরেছে যা তার সঙ্গে থেকেই বুঝতে পারা যেতো। লেখা সম্পর্কে রাকেশ বেশ সচেতন ছিল, সচেষ্ট ও সৎ। তার প্রথম কমিটমেন্ট লেখার প্রতি, তার সঙ্গে কোনো রকমে সমঝোতা করতে রাজী ছিল না। যে কোন রচনা লেখা, তাতে সংশোধন করা, এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট হয় ততক্ষণ রচনা ছাপাতে না দেয়া, তার স্বভাব ছিল। নাটকে ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে সে বিশেষ সচেতন ছিল, তাকে স্মার্ট, সারগর্ভিত এবং প্রভাবপূর্ণ করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করে যেত। এই কারণেই পরিমানে তার নাট্য-রচনা খুব সীমিত। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২-মধ্যে ১৫ বছরে সে কেবল তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করে, এবং কয়েকটি একাঙ্ক ও শ্রুতিনাটক ইত্যাদি লেখে। একটা নাটক 'পৈর তলে কী জমীন' অসম্পূর্ণ থাকে, যা পরে কমলেশ্বর সম্পূর্ণ করে। লেখার ব্যাপারে রাকেশ দারুণ মেজাজীও ছিল—এয়ারকন্ডিশন্ড ঘর, নিজস্ব টেবিল, নিজস্ব টাইপ রাইটার, সিগারেট-সিগার, চারদিকে শান্তি, টেলিফোন নয়, কোন কথা নয়, কেউ শুধু চা-কফি দিয়ে যাবে। ব্যস। এ ধরনের পরিবেশে বহুবার ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে বসে কাটিয়ে দিত, একটা লাইনও লেখা হত না, তবুও সে ঘর থেকে বাইরে বেরুনোর সময় না হলে বেরুতো না। যাযাবরী বৃত্তি এবং মহিলাদের (যুবতীদের) সাথে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গ হওয়ার দরুন মাঝে কয়েক বছর দিবসের কয়েক ঘণ্টা তাদের সঙ্গেই কাটত যার বিস্তৃত বিবরণ রাকেশ তার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করেছে। পরে, যখন সত্যিসত্যি তার গৃহ হয় এবং সে পরিবার গড়ে তোলে, পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়িত্বের অনুভব করতে থাকে, তখন তাঁর সেই যাযাবরী বৃত্তি ও যুবতী বান্ধবীদের সংসর্গ হ্রাস পেতে থাকে, সারাটা সকাল সে লেখালিখিতে নিয়োজিত করে।

কয়েকটা ব্যাপারে রাকেশ বেশ দৃঢ় ছিল, নিজের সিদ্ধান্তে আঁকড়ে থাকত। লেখালিখি করে জীবিকা চালানোর পক্ষপাতী ছিল। নানান প্রসঙ্গে সে বহুবার এই ব্যাপারে আলোচনা করেছে। এই জন্য পারিশ্রমিক ও রয়ালটি সম্পর্কে তার বেশ দৃঢ় মনোভাব ছিল। মনে যা ঠিক করে ফেলত, তা আঁকড়ে থাকত। সরাসরি বলত, যদি আপনি মনে করেন রাকেশ ভাল নাট্যকার এবং তার উচিৎ ভাল নাটক রচনা করা, তাহলে তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া দরকার। পারিশ্রমিক নিয়ে বেশ কয়েকবার বন্ধুবান্ধব, প্রকাশক বা পরিচালকের সঙ্গে তার মন কষাকষি হয়েছে, তবুও নিজের ব্যাপারে সে দৃঢ় থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, তার একগুয়েমির পেছনে এমন সঙ্গতি, বিবেক এবং ঔচিত্য থাকত, শেষ পর্যন্ত তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হত। সম্ভবত রয়ালটি সম্পর্কে তার আগ্রহের দরুণই প্রকাশক ও পরিচালকদের উপযুক্ত রয়ালটি দেওয়ার দিকে উন্মুখ করেছে। তা সত্ত্বেও এব্যাপারে প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে বিপরীত নীতিও সহজে গ্রহণ করত। সে স্থির করেছিল দিল্লী, কলকাতা বা বোম্বাই মহানগরীতে যে ব্যক্তি বা দল তাঁর নাটক প্রথমবার মঞ্চস্থ করবে, অগ্রিম হিসেবে তাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে, এবং তারা ঐ নাটক দশবার মঞ্চস্থ করতে পারবে, যদি তারপর আরো মঞ্চস্থ করা হয়, তাহলে পঞ্চাশ টাকা প্রতি প্রদর্শনের হিসেবে রয়ালটি দিতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার এই শর্ত স্বীকৃত হয়। মাঝেমাঝে বিরোধ ও মন কষাকষি হয়েছে। কিন্তু বেনারসে যখন 'আধে অধুরে' মঞ্চস্থ হয়, তখন সে রয়ালটির সম্পূর্ণ টাকা ছেড়ে দেয়, যাতে নাট্যদলের ওপর চাপ না পড়ে।

এমন কি পত্র-পত্রিকা থেকে পাঠানো টাকা নিয়েও সে মাঝে-মাঝে দারুণ বিব্রত সৃষ্টি করত। এবং তার যুক্তি কারণসঙ্গত হওয়ার দরুণ প্রকাশককে শেষাবধি তার শর্ত মানতে বাধ্য হত। উদ্ধৃতি আছে ৩০.৯.৬৭ ডায়রীর একটা অংশে — ধর্মবীর ভারতী এবং কমলেশ্বর বন্ধু হওয়া সত্বেও 'সারিকা'র তরফ থেকে দেয়া পারিশ্রমিক নিয়ে বিরোধ ঘটে, যার প্রমাণ—

'ভারতী এবং কমলেশ্বরের চিঠিতে পারিশ্রমিকের কথা ছিল। 'ধর্মযুগ' থেকে ১৫০ টাকার চেক এসেছিল। যদিও ছ'মাস আগে তাদের লিখেছিলাম পরবর্তীকালে প্রকাশিত রচনার জন্য ২৫০ টাকার কম পারিশ্রমিক আমি স্বীকার করবো না। ভারতীর চিঠির সঙ্গে আমি চেকটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিই। দুজনকেই লিখে জানাই কোম্পানীর বর্তমান অবস্থায় এই নিয়মাবলী নিয়ে কিছু করা যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে আমার তরফ থেকে এই প্রতিবাদ অন্তত থাকবে যে 'সারিকা' ও 'ধর্মযুগে' ইদানিং প্রকাশিত চারটি রচনার চেক ফেরৎ পাঠাচ্ছি। প্রতিবাদ ছাড়া এই অবস্থা স্বীকার করে নেব, এ সম্ভব নয়। বুঝতে পারি না, ছ বছর আগেকার পারিশ্রমিক দর রিভাইজ করার জন্য এরা মিলেমিশে স্ট্যান্ড কেন নিতে পারছে না। যাকগে, নিতে পারছে না, এটা তাদের অসুবিধে। অবস্থাকে স্বীকার না করতে পারাটা আমার পক্ষে অসুবিধে। কোম্পানী উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া এফর্ড করতে পারে না, কিন্তু একজন লেখক তার পারিশ্রমিক না নেয়াটা এফর্ড করতেই পারে।'

[ডায়রী, পৃঃ ৩০২]

সেই সঙ্গে ১৯.১১.৬৭ এর ডায়রীতে উদ্ধৃত 'জ্ঞানোদয়' সম্পাদক লক্ষ্মী চন্দ্র জৈন কে লেখা পত্র—যা লেখক-প্রকাশক সম্পর্কিত, Writers remuneration এবং নিজের কথা দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাবে বলার প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ আছে —

'প্রিয় ভাই,

আপনার চিঠির উত্তর কিছু দেরী করে দিতে হল। এরই মাঝে অনীতাকে দেখতে বোম্বাই গিয়েছিলাম। সেখানে আমার মেয়ের জন্ম হয়েছে।

আপনি চিঠিতে 'Contract letter' এর শর্তের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কনট্র্যাক্ট লেটার বা চিঠির কপি হস্তাক্ষর হয়ে আমার কাছে ফেরৎ আসেনি। দয়া করে আমার কপিটা পাঠিয়ে দেবেন।

দুঃখ এই, আপনি আমার চিঠির একেবারে আলাদা অর্থ করেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কিছু বলার আগে আপনার তোলা বিষয়গুলির ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

আপনার হয়তো সেসব কথাবার্তা মনে আছে যা আমাদের মধ্যে গত বছরে আপনার বাড়িতে হয়েছিল। তখন স্থির হয়েছিল, জ্ঞানপীঠের প্রকাশন-পরিকল্পনা অনুসারে

এক-একটি পুস্তকের প্রকাশনের সময় এলে আপনি আমায় সংবাদ পাঠাবেন এবং আমি মাস-দুমাসের ভেতর ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। ক্রম এরূপ হবে — প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'আখিরী চট্টান তক' নাটক এবং উপন্যাস। কিন্তু 'পরিবেশের' প্রকাশনের পর এই মে অবধি আপনার তরফ থেকে অন্য গ্রন্থ 'আখিরী চট্টান তক' এখনো চেয়ে পাঠান নি। তখন আমিই নিজের তরফ থেকে আপনাকে ঐ ব্যাপারে লিখেছিলাম। তখনকার আপনার চিঠিপত্রে স্পষ্ট আভাস ছিল যে আপনি 'আখিরী চট্টান তক' কে এখন দ্বিতীয়র বদলে তৃতীয় গ্রন্থ রূপে নিতে চান। তাই আমি সেটা অন্যত্র প্রকাশ করার কথা লিখেছিলাম, তখন আপনার তরফ থেকে জানানো হয় যে তার প্রকাশনা জ্ঞানপীঠই করবে। যদিও নতুন ভাবে 'আখিরী চট্টান তক' এর পাণ্ডুলিপি আমার কাছে মে-জুন থেকে তৈরি রাখা আছে, তবুও আমি মনে মনে ভেবেছি, যদি আমি আপনাকে একটা নতুন বই দিই আপনি সেটা বেশী পছন্দ করবেন। এই জন্য আমি 'তীন বীজ নাটক' নামে বইটার প্রকাশ সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়ার ভুল করে বসি। মনে মনে হয়তো এমন ধারণা ছিল, এ ধরনের পরীক্ষামূলক লেখার প্রকাশ হয়তো জ্ঞানপীঠের উদ্দেশ্যের খুব কাছাকাছি হবে। তবুও আমি এই নির্ণয় আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম, আপনি ইচ্ছে করলে একে নাটকের স্থানে নিতে পারেন, অথবা এর জন্য নতুন কনট্রাক্ট ফর্ম পাঠাতে পারেন। উদ্দেশ্য ছিল, নাটকের কনট্রাক্ট আপনি যথাযথ রাখতে চাইলে এটা আমি অতিরিক্ত পুস্তক রূপে আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু অনেকদিন অবধি আমি এর উত্তর পাই না। উত্তর পেলাম ব্যক্তিগত সাক্ষাতের পর 'যাত্রিক' এর বাইরে। যদিও এক একটি পুস্তক প্রকাশন-শিডিয়ুলে এনে তার পাণ্ডুলিপির আমন্ত্রণ আপনার তরফ থেকে পাঠানো হয়নি, তা সত্ত্বেও আমার উপর দোষারোপ করা হয়, যে আমি নাকি কনট্রাক্ট অনুযায়ী সময় মতো পাণ্ডুলিপি দিই নি।

যাহোক, 'তীন বীজ নাটক' এর প্রকাশনার ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি 'রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন' থেকে। অবশ্য এই ব্যবস্থা অন্য কোথাও থেকে হতে পারত। এবার এছাড়া অন্য অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে হতে পারে, যে, আমি নাকি প্রাথমিকতা, অন্য প্রকাশকদের দিয়ে থাকি। আমার মনে হয় যে অগ্রিম টাকাপয়সা এবং কনট্রাক্ট ফর্ম সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তি আপনার মনে আছে, যা এখানে দূর করে নেয়া উচিৎ।

যে সময়ে আপনার সঙ্গে এই বইয়ের কথা হয়েছিল, সে সময়েই আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম—দুটি নাটক (পৈর তলে কী জমীন এবং 'আধে-অধুরে') এবং দুটি উপন্যাসের কনট্রাক্ট আমার আগে থেকে করা আছে। আগামী ছ-সাত মাসে এই পুস্তক দুটি অন্যত্র প্রকাশিত হলে আমার ওপর ভিত্তিহীন অভিযোগ যেন না করা হয়, যে "কনট্রাক্টের অনুরূপ কোন কৃতি তৈরি হওয়ার পরেও তা জ্ঞানপীঠে পাঠানো না-পাঠানোর অধিকার লেখকের রয়েছে।" —এইজন্য অবস্থার সুস্পষ্টকরণ হওয়া প্রয়োজন। একটা নাটক বা উপন্যাস রচনা করা এমন প্রক্রিয়া নয় যে যাকে পুরোপুরি সময়ে বাঁধা যায়। আমার পুরো সময় আমি লেখায় দিই, তবুও যতক্ষণ কোনো রচনায়

পূর্ণ সন্তুষ্ট না হই, ততক্ষণ তা প্রকাশার্থে ঠেলে দেওয়াতে বিশ্বাস করি না। এই কারণে, ৬৩ এবং ৬৪ এর কনট্রাক্ট অনুসারে দেয় সমস্ত রচনা আমি অদ্যাবধি দিতে পারিনি। জ্ঞানপীঠ থেকে গৃহীত আড়াই হাজার টাকার মধ্যে 'পরিবেশ' বাবদ ছ'শো টাকা বাদ দেয়ার পর আমার কাছে যে উনিশশো টাকা পাওনা আছে, তার ভার ও কিছুটা 'তীন বীজ নাটক' প্রকাশনার প্রস্তাব দেয়ার মূল ব্যাপারে নিহিত ছিল। কিন্তু একটা ভুল ধারণা আপনার মন থেকে বার করে দেয়া দরকার। অগ্রিম অর্থ শুধু জ্ঞানপীঠ-ই-নয়, অন্যান্য সমস্ত প্রকাশন সংস্থা দিয়ে থাকে। রাজপাল, রাজকমল এবং রাধাকৃষ্ণ—এই তিনটি প্রকাশন সংস্থা থেকে আমি যখন-তখন প্রয়োজনানুসারে দু-হাজার তিন-হাজার টাকা নিয়ে আসি এবং এখনও নিয়ে থাকি। কনট্রাক্ট ফর্মে অগ্রিমের সঙ্গে সঙ্গেই হস্তাক্ষর হয়ে থাকে এবং পাণ্ডুলিপি তৈরী হলে আমি তাদের দিয়ে থাকি। 'আমার এতটা অগ্রিম আপনার কাছে রয়েছে'—এমন কথা উল্লেখ করে আজ অবধি তাদের কেউ আমাকে বলেনি। যদিও এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার, যে তারা প্রতিবছর এত বিক্রী করে যে বৎসরান্তে হাজার বারোশ'র বেশী তফাৎ হিসেবে থাকে না। তাছাড়া অন্য কোনো কিছু প্রথমে তৈরি হয়ে গেলে আমি তাদের ছাপিয়ে নিতে বলেছি, তবুও তাঁরা কনট্রাক্ট ফর্মের উল্লেখ করে কখনও কথা বলেনি। এ ধরনের প্রশ্ন এই প্রথম জ্ঞানপীঠ সম্পর্কেই তোলা হল।

আমি বস্তুত ভেবে পাচ্ছিনা যে, এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেব। আপনাকে আমার বন্ধু এবং হিতৈষী বলে যেমন আগে মনে করতাম, তেমন আজও মনে করি এবং ভবিষ্যতেও মনে করবো। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এই ধরনের মতানৈক্যের চেয়ে অধিক মহত্বপূর্ণ। নিজের আত্মসম্মান, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং টাকা-পয়সায় আমি কাকে কতটা মহত্ব মনে করি, এই সব 'সারিকা প্রকরণে' স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। তারপরেও আমি যখন ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হতে দিইনি, তা হলে আজ কেন খারাপ হতে দেব? উনিশশো টাকা এমন কিছু বেশী নয় যে তা নিয়ে আমাদের সম্পর্ক কষ্টিপাথরের যাচাই হবে এবং এই দিক দিয়ে যে-কোনো অ্যামাউন্ট-ই বড় নয়। এই সময় দুটো বিকল্প সামনে আছে। হয়, কনট্র্যাক্টের শর্তানুসারে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে আমার এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া উচিৎ, নয় দেয়-অগ্রিম টাকা ফেরৎ দিয়ে। আপনি এর মধ্যে যে শর্তে রাজী আমি তার জন্য প্রস্তুত। যদি প্রথম ব্যাপারটা চান তাহলে আমাকে তিনটে বই সম্পর্কে এখনই লিখে জানান কবে নাগাদ সে গুলি প্রেসে দেয়া হবে, তাহলে সেইসব পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে পাঠানোর নিশ্চিত তারিখ আমি লিখে জানাতে পারি। আপনার দপ্তর থেকে ছয় মাসেও চিঠি না এলে আমার ওপর অভিযোগ হয় যে, আমি পাণ্ডুলিপি পাঠাচ্ছিনা— আমি এটা পছন্দ করবো না। আর আপনি যদি অন্য ব্যাপারটা বেশী পছন্দ করেন, তাহলে উনিশ শো টাকা—হয় জানুয়ারী-অক্টোবর মাঝে আমি দশ কিস্তিতে আপনাকে ফেরৎ দেবো, অথবা আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে একসঙ্গে থোক দিতে পারি। এর মধ্যে যে প্রস্তাব আপনার যথাযথ মনে হবে আমি তাতে রাজী। তবে, হ্যাঁ, একটা অনুরোধ। এরপর

দয়া করে অগ্রিম টাকা এবং কন্ট্র্যাক্টের শর্ত উল্লেখ করে চিঠি লিখবেন না। এ ধরনের ব্যাপার কোন ব্যবসায়িক প্রকাশকেও করে না—আর জ্ঞানপীঠের তো এক নিজস্ব স্থান এবং স্তর আছে।

আশাকরি, ভাল আছেন। কুন্থা দেবীকে নমস্কার জানাবেন।

প্রীতিসহ
মোহন রাকেশ

এধরনের প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠতো, তবে রাকেশের কি স্ট্যান্ড হবে এটা স্থির থাকত। তার আগ্রহ থাকত, যে, অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া অধিকতম সুবিধা বা পারিশ্রমিকের অধিকারী আমিও বটে। একবার বেশ বড় একটা অনুষ্ঠান সে কেবল এই কারণেই শরিক হয়নি, যে, অন্য দু-চারজনকে বিমানের ভাড়া দেয়া হয়ছিল এবং তাকে দেয়া হয়নি। [যদিও প্রায় চল্লিশ জন লোক এসেছিল, এবং অন্যান্যরা ট্রেনে এসেছিল]

রাকেশের জীবন এবং ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ শেষ করা হচ্ছে ডায়রীর কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে—

'জলন্ধরে থাকাকালীন আমি যা ভাবি এবং যা অনুভব করি, সেখান থেকে বেরিয়ে তেমন করি না। গতবারে দিল্লী থাকাকালীন আমার এই ভাবুকতা খুবই ছেলেমানুষ এবং উপহাস্যাস্পদ ধরণের মনে হয়েছিল—আজ এখানে এসে তেমন মনে হয় না—তবে এটা অবশ্য মনে হয়, পৃথিবী বিশাল এবং বিশালতার অংশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জীবনের চলার পথ শুধু এই অংশ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আমার এই যন্ত্রণা অসত্য নয়, আমার এই আঘাত অস্থির-উত্তেজিত করেছে প্রচুর এবং পরবর্তী কালে জীবনের লক্ষ্য এতে বদলে গেছে অনেকখানি, কিন্তু এই আধার কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা যায় এমন ব্যাপার তো নয়। তবে, মন কে বোঝানোর জন্য এও বলা যেতে পারে যে, এতে এমন কিছু রেখা তৈরি হয়, যা কষে জড়িয়ে ধরে, জীবন কে বড় 'কনভেনশনাল' করে তোলে—এখন অন্তত নির্মুক্ততা তো থাকবে। জানি, এসময় এরকম ভাবনা আত্মপ্রতারণা হতে পারে। মিথ্যা বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় নানান পথ-দিশা দেখে মনে-মনে কিছুটা সুখ অবশ্য পাওয়া যায়। এই সব পথ আমার। বিশালতার সৌন্দর্যের প্রতিটি কণা আমার।' [১০.৬.৫৮)

'আমি চাই, আমি যত কাজ করেছি, তার চেয়ে যেন আরও বেশী ভাল কাজ করতে পারি। অদ্যাবধি আমি এমন কিছু লিখিনি যাকে সন্তোষজনক বলতে পারি।'

(১.৭.৫৮)

'এর অর্থ তো এই, ব্যক্তি কারোকে বিশ্বাস করে না, কারো সঙ্গে অকপট চিত্তে কথা বলে না, কারো সামনে মন উজাড় করে প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। নিজের জন্য এক চেহারা এবং পৃথিবীর জন্য আরেক চেহারা রাখে। আমার সবচেয়ে বেশী দুর্বলতা এই যে, আমি যাকে বিশ্বাস করি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি এবং যতক্ষণ না কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে ততক্ষণ তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। বহুবার ইচ্ছে করে, নিজের সবকিছু সকলকে বলে দিই—প্রতিটি লোকের সামনে নিজের 'কনফেশন' করি—কিন্তু 'পরিণাম' সমনেই রয়েছে।

* * * *

এ ব্যাপারে আমার কোনো অনুশোচনা নেই যে, আমি দুজন বন্ধুকে হারিয়েছি। মানবিক সম্পর্ক শাশ্বত হয় না। কিন্তু অনুতাপের ব্যাপার হল, যে, বন্ধুত্ব এবং মানবিক সম্পর্কের বিশ্বাসকে ঐ ঘটনা এমন আঘাত দিয়েছে, মনে হয়, প্রত্যেককে সন্দেহ করা উচিত — মনে বিশ্বাস জন্মালেও তা চেপে রাখা উচিত। জীবন বিশ্বাসে চলে না, 'ট্রাস্ট' এ চলে।

(৬.৯.৫৮)

এখন দিন যেমন কাটছে, গোটা জীবন যদি এমন ভাবে কাটে! কি ভাল হয়? ব্যস্ত থাকা — মন-মাফিক কাজ করা, মন দিয়ে কাজ করা—নিজেরই প্রভুত্ব এবং নিজেরই শাসনে চলা — কত ভাল লাগে? এই আন্তরিক ব্যস্ততাই সম্ভবত জীবন — এটাই সবচেয়ে বড় সুখ।'

(১৭.৯.৫৮)

তাহলে, রিসার্চ স্কলারশিপ থেকে আমার রেজিগনেশান স্বীকৃত হয়ে গেছে।

আজ থেকে বাস্তবিক সংঘর্ষের গতিধারা শুরু হয়। আই অ্যাকসেপ্ট দি চ্যালেঞ্জ অফ লাইফ, আই বিলীভ দ্যাট আই শ্যাল নট ফেল।

(২৪.১১.৫৮)

'আমি শুধু চিন্তা করি।

'মনে হয় জীবনে কোন রঙ নেই, স্বাদ নেই — প্রতিটি ব্যাপার পানসে—

আমার কি লেখা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে?

(১৮.১.৫৯)

'বুঝতে পারছিনা কি লিখতে চাই। কেন আজ মাস কয়েক পরে ডায়রী তুলেছি....কেনই বা কয়েকটা পঙক্তি লিখে পাতা ছিঁড়ে ফেলছি...কেন দ্বিতীয়বার লিখে তিনটে শব্দ কাটার জন্য থেমে গেছি....মন স্থির অজটিল, নাকি এখনও বিব্রত?

একটা আলোড়ন অবশ্য আছে। অশান্তি। কোন কিছু ভেতরে-ভেতরে চিড়ে চলেছে। কেন? কার জন্য? কি কারনে সে নিজের নয়?

হয়তো। যদিও মেনে নিতে কষ্ট হয়। গত কয়েক বছরে খুবই বিব্রত, অস্থিরভাবে কাটিয়েছি। অধিকাংশ নিজের স্বভাবেরই দরুন। বস্তুত, আমি কেমন? কোথাও খুবই রুক্ষ, কোথাও বা খুব কোমল। এক মুহূর্তে খুব খুশী, পরমুহূর্তে খুব উদাস। অবস্থা মনকে খুবই 'কনফিউজড' করে দিয়েছে। কোনো কোনো মুহূর্তে নিজের প্রতি দারুণ বিশ্বাস হয়, কোনো মুহূর্তে একেবারেই হয় না। কখনও নিজেকে খুবই পূর্ণ মনে হয়, যেন বছর-বছর লিখেও হাল্কা হবে না। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই অবস্থা একেবারে ভিন্ন হয়ে ওঠে। মনে হয়, এ এক মিথ্যে ভ্রম, শুধু এক ভিত্তিহীন উৎকণ্ঠা। নইলে নিজের কিছুই নেই। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। বয়স পেরোতে-পেরোতে হয়তো পেরিয়ে যাবে— একটা কাঁপা অসন্তোষ। কিছু বুঝতে পারছি না। বহুবার নিজেই বলেছি— প্রকৃতির তামাসা হয় কয়েকজন। যোগ্যতা তাদের মধ্যে না থাক, ব্রেক

একটা আলোড়ন তোলা হয়। তত্ত্ব হয় না, শ্রেফ আভাস। এই আভাস-ই আজীবন ছলনা করে যায়। বলতে গিয়েও মনে হয়, আমার নিজের ভেতরের আলোড়ন আভাসের ছলনা নয় তো?

(১৫.৯.৬৩)

এরই মাঝে আম্মার মৃত্যু হয়। রাকেশের পক্ষে মস্ত বড় আঘাত, বড় অভাব। কিন্তু সকলকেই এমন আঘাত সহ্য করতে হয়, এবং তা থেকে উত্তরণও করতে হয়। রাকেশও তাই করেছে। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন যে অভাবের সৃষ্টি সে করে যায়, তা সহ্য করতে পরিবারের লোকেদের, বন্ধু-বান্ধবদের, পাঠকের, সমগ্র সাহিত্য-জগতের ওপর দারুণ আঘাত নেমে আসে। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ সেই প্রাণঘাতী সন্ধ্যা! দু-তিন ঘন্টায় রাকেশকে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অপরাহ্নে এশিয়া ৭২এর মেলায় যাবার জন্য সে তৈরী হয়, অথচ পা এগিয়ে যায় অন্য কোন দিকে। রবিবারের সন্ধ্যা—চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়ে। যতটা সম্ভব সবই করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ। ৪ ডিসেম্বর সকাল। ঘর লোকজনে ভর্তি—তারজন্য, যার কোনো লোকেরই প্রয়োজন ছিল না তখন। শারীরিক ভাবে যদিও সে কিছুটা সেখানেই ছিল, কিন্তু মন ও আত্মায় অনেক দূর উড়ে চলে গেছে। এই প্রথম ও শেষবার, যখন তার নিজের ধারেকাছে কারো প্রয়োজন ছিল না। একা থাকতে চাইত সে—কিন্তু জীবন যে খুবই ক্রূর। বেঁচে থাকতে এক রকম.....চলে যাওয়ার পর আরেক রকম....।

'রাকেশ চলে গেছে.....সে আমাকে এবং সন্তানদের একা ফেলে গেছে....এজন্য দুঃখ ততটা ছিলনা বরং দুঃখ এজন্য যে, তার বেঁচে থাকার শখ ছিল.....জীবনের প্রতি তার গভীর মোহ ছিল। সে এমন একজন, যে বেঁচে থাকাটা জানত, যে লোকেদের বেঁচে থাকা, হাসা, এবং খেলা করতে শিখিয়েছিল।'

জীবনের শুরু থেকেই তাকে সংঘর্ষ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এজন্য ভয় পেয়ে, জীবনের শেষই যে সমস্যার শেষ—এটা সে কখনও স্বীকার করেনি। এ ব্যাপারে আমি অবশ্য কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি, কারন তার জানা হয়নি যে তার জীবনের শেষ হয়েছে—কেননা সে সহ্য করতে পারত না।

[চন্দ সতরেঁ ঔর পৃ:৯৫-৯৬]

রাকেশের যখন মৃত্যু হয়, তখন সে ৪৮ বছরও পূর্ণ করেনি, এক মাস বাকী ছিল। কিন্তু এই স্বল্পায়ু জীবনে সে উপন্যাস, কাহিনী, নাটক, একাঙ্ক নাটক, প্রবন্ধ, জীবনী এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সৃষ্টি করেছে। হিন্দি ও ইংরেজীতে এম. এ. কয়েক বছর কলেজে অধ্যাপনাও করেছে, 'সারিকা' পত্রিকার সম্পাদনা করেছে। কিন্তু সব কিছু নিজ শর্তানুসার। স্ব-ইচ্ছা এবং স্ব-সুবিধামত। জীবনীশক্তিতে ভরপুর, আত্মমত্ত আনন্দে, দারুণ জেদী, দারুণ একরোখা, দারুণ উদার এবং সময়-অসময়ে স্বার্থপরও, রয়ালটি রেমুনারাশনের ব্যাপারে কাউকে না-ছাড়া, দারুণ অনুশাসন প্রিয় এবং দারুণ মুক্ত—অনেক ভাবনার সমুচ্চয় ছিল রাকেশ, মোহন রাকেশ।

কৃতি ও কৃতিত্ব

মোহন রাকেশ হিন্দিজগতে পদার্পণ করে একজন গল্পকার হিসেবে, তারপর দেখা দেয় তাকে ঔপন্যাসিকের ভূমিকায়, তারপর নাট্যকার রূপে। এই সঙ্গে তার প্রবন্ধ সংকলন, জীবনী সংকলন এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও প্রকাশিত হয় এবং সেই সবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ১৯৪৮ থেকে সে নিয়মিত-অনিয়মিত ভাবে ডায়রীও লিখে চলে এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ অবধি লেখা ডায়রীর অংশ, 'মোহন রাকেশের ডায়রী' শিরোনামে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে রাকেশের লেখার এই বিবিধ বিষয়, তার চিন্তা-ভাবনা এবং লেখন ক্ষমতার গভীরতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করায়। রাকেশ তার নিজের সমস্ত লেখাই তার সময়ের, তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিখেছে, তার ধারণা ছিল যে, সৎ লেখা সেটাই, যাতে লেখক নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত একটি জগৎ সৃষ্টি করে। নিজের জানা এবং উপভোগ করা মুহূর্ত-ক্ষণকে বানীদান করে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে 'নতুন' সাহিত্যসৃষ্টি শুরু হয়—স্বয়ং রাকেশ যার একটি মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল—তার অধিকাংশই শহরের বাসিন্দা, শহুরে-মানসিকতার মধ্যবিত্ত লেখকদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, গত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরে রচিত নানান সাহিত্য-কৃতি তা উপন্যাস-কাহিনী-নাটক বা কবিতা হোক—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহুরে পরিবেশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহুরে সমস্যার চিত্র মুখ্যত পাওয়া যায়। আজকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি নিজের সমস্যার বিব্রত। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, নিজের অস্মিতার পরিচয়, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, নতুন জীবন-মূল্যের স্থাপনা, নারী-পুরুষ সম্পর্কে নতুন ডায়মেনশান, ব্যক্তিগত মুক্তির কামনা— যা অনেকসময় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েও স্বেচ্ছাচারের রূপ গ্রহণ করে, একাকীত্বের অনুভূতি—ইত্যাদি নানান প্রশ্ন, যার মুখোমুখি আধুনিক মানুষকে অবিরাম হতে হয়। গত চল্লিশ বছরে লেখা হিন্দি সাহিত্যের মূল স্বর এটাই। বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাবলি শিক্ষা, বেকারীত্ব, দুই পুরষের মাঝে জীবন-বোধের পার্থক্য, জেট বিমানের গতিতে পরিবর্তিত পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টায় দৌড়ানো-ছ্যাচড়ানো মানুষ, চারদিকের ভয়ঙ্কর মূল্যহীনতায় আর্তনাদ করা (এবং দিকভ্রান্তও) নতুন জেনারেশান ইত্যাদির ওপর অপেক্ষাকৃত কম লেখা হয়েছে। প্রেমচন্দ যুগের সামাজিক সচেতনতা পরবর্তী যুগে ব্যক্তিপ্রধান হয়ে গেছে। তার কাছে সামাজিকতা গৌণ। রাকেশ এমনই যুগে লেখা শুরু করে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর অবধি (৫০ থেকে ৭০ অবধি।) নিজের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, ব্যক্তিগত সমস্যাবলি

এবং ব্যক্তির অর্ন্তমনের জটিলতা গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে, আজকের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানান অনুভূতি, বাসনা এবং কুণ্ঠাকে উদ্ভাসিত করে। কখনও তা সহানুভূতি-সহ তাদের সুখ-দুঃখকে মুখর করেছে, আবার কখনও খুব নির্মম ভাবে তার কাঁটা-ছেঁড়া করেছে, কিন্তু যাই করেছে, সততার সঙ্গে করেছে, আন্তরিকতার সঙ্গে করেছে।

কাহিনী

রাকেশ তার লেখা শুরু করে কাহিনী দিয়ে। রাকেশ এবং তার সমকালীন অন্যান্য লেখকরা যে কাহিনীর জন্ম দেয়, তার স্বরূপ পূর্ববর্তী কাহিনী থেকে একেবারে ভিন্ন ছিল। সামাজিক চেতনা, সামাজিক সমস্যার চিত্র, দেশ প্রেমের ভাবনা এবং আদর্শপ্রিয়তার স্থানে এদের কাহিনীর মূল স্বর হল— ব্যক্তিগত সমস্যা, সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, নারীপুরুষের সম্পর্কের বিভিন্ন স্বরূপ, স্তর ও তাদের মাঝে ফাটল, পরম্পরাগত সংস্কারের ভাঙচুর এবং সেই স্থানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, যৌন-সম্পর্কিত আড়ালের পরিবর্তে খোলাখুলি বিবরণ ইত্যাদি। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারেও তফাৎ ছিল—খুবই সহজ, সরল, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা। প্রয়োজনানুসারে তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী, সহজে মনকে স্পর্শ করে, বিদ্ধ করে। এই নতুন ভঙ্গির কাহিনীকে 'নঈকহানী' নামে অভিহিত হয়—এবং পরবর্তীকালে এই কাহিনীর তিন জন মুখ্য গল্পলেখক সর্বাধিক মহত্ত্বের অধিকারী হন—রাজেন্দ্র যাদব, মোহন রাকেশ এবং কমলেশ্বর।

এখানে হিন্দিতে লেখা 'নঈ কহানী' সম্পর্কে সামান্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে আদর্শনিষ্ঠা ধারণা রোমান্টিক ভাবনা ও অলঙ্কৃত ভাষার ব্যবহার হিন্দিতে কবি ও গল্পলেখকেরা করে এসেছে, তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে **'নঈ কবিতা'** এবং **'নঈ কহানী'** আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দিতে তৎকালীন অধিকাংশ কবি ও গল্প লেখক এই 'নতুনত্বের' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা জীবনকে অতি সহজ ও বাস্তব রূপে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। 'নঈ কবিতা'র আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়, 'নঈ-কহানী' পরে। রাকেশের অনুসারে 'নঈ কহানীর' আন্দোলন নঈ কবিতার মূল্যের প্রতি বিদ্রোহের স্বর নিয়ে এসেছে এবং তার মূল স্বর হল—কুণ্ঠার প্রকাশ ভাবনায়, মানুষের বাস্তবতাকে তার সামাজিক পরিস্থিতির পরিপার্শ্বে যাচাই করে অঙ্কন করা।

(বকলম খুদ, পৃ:৮১)

এই গ্রন্থে পরে বর্ণিত বিচার-বিশ্লেষণ উল্লেখনীয়, নতুন কাহিনী পুরনো কাহিনীর নতুন রূপ নয়, কথাসাহিত্য গদ্যের এ এক নতুন ক্ষেত্র—যাতে যুগের সমস্ত বস্তুবাদী ও কাব্যময় অনুভূতি নিয়ে রচনার প্রয়োগ করা যায়, করা হচ্ছে। (ঐ, পৃ:১০৫)

নতুন গল্প আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্ণধারের বক্তব্যে এই ধারণা বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যে, 'নঈ কহানীর' গল্প লেখকেরা নিজেদের

পরিবেশের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিল, যদিও তার স্বরূপ ছিল আলাদা, তার কেন্দ্রে ছিল ব্যক্তি, অর্থৎ সে নিজে। তার ডায়রীর পাতা এবং তার কাহিনী সঙ্গে সঙ্গে পড়লে আমরা তার আন্তরিক ভাব, বিচার মান্যতা, ধারণা, পরিস্থিতি এবং তার রচনায় বর্ণিত চরিত্রের পরিস্থিতি ও মনঃস্থিতিতে অদ্ভুত সামঞ্জস্য পাই। এই তথ্য তার শক্তি বটে, সম্ভবত সীমাও। সময় কাল ঐ প্রমাণ করবে, তার কৃতিসমূহ তার যুগ এবং লেখকের মান্যতা ও পরিস্থিতির সীমা অতিক্রান্ত করে কতদূর সর্বজনীন ও সর্বকালীন হতে পারে।

রাকেশের প্রথম গল্প সম্ভবত 'নন্হী' রচনা-কাল মে, ১৯৪৪। তখন সে উনিশ বছরের। রাকেশের পরীক্ষার খাতা থেকে গল্পটি উদ্ধার করে কমলেশ্বর ১৯৭৩ 'সারিকা' পত্রিকায় 'মোহন রাকেশ স্মৃতি সংখ্যা'য় প্রকাশ করে। পরে তা এগারোটি গল্পের সঙ্গে 'এক ঘটনা' সংকলনে প্রকাশিত হয়। এই সব গল্পই ১৯৮৪ সালে পুর্নমুদ্রিত 'মোহন রাকেশ-এর সমগ্র গল্প' শিরোনামা সংকলনে সম্মিলিত হয়েছে। অবশ্যই এই সব গল্প রাকেশের দৃষ্টিতে তেমন মহত্ত্বপূর্ণ ছিল না, এই কারণে সে এগুলি প্রকাশিত করে নি।

'নন্হী' গল্পের খাতাতেই নানান ভাবে 'রাকেশ' শব্দটি লেখা হয়েছিল। সম্ভবত, তখন থেকেই এই নাম তার মগজে ঘোরাফেরা করছিল এবং পরবর্তীকালে তার সাহিত্য-নামে যুক্ত হয়েছিল।

রাকেশের গল্প সংগ্রহ প্রকাশনে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। সর্বপ্রথম 'ইনসান কে খন্ডহর' (১৯৫০), 'নয়ে বাদল' (১৯৫৭), 'জানোয়ার আউর জানোয়ার' (১৯৫৮), 'এক আউর জিন্দগী' (১৯৬১), 'ফৌলাদ কা আকাশ' (১৯৬৬) সংকলন বার হয়। পরবর্তী কালে রাকেশ এই পাঁচটি সংকলনে প্রকাশিত গল্পগুলিকে বিষয় বস্তু অনুসারে পুনঃসংকলিত করে এবং ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ এর মাঝে 'আজ কে সায়ে' (১৯৬৭), 'রোঁয়ে রেশে' (১৯৬৯), 'এক এক দুনিয়া' (১৯৬৯) 'মিলে জুলে চেহরে' (১৯৬৯), রোশিনামায় চার খণ্ডে প্রকাশ করে। এই গল্পগুলিই ১৯৭২ সালে সে আবার তিনটি মলাটে বার করে। এবার প্রকাশিত হয় 'কোয়াটার', 'পহচান' এবং 'ওয়ারিশ' নামে। এ ছাড়া 'সুহাগিনে', 'মেরী প্রিয় কহানিয়াঁ', 'শ্রেষ্ঠ কহানিয়াঁ' ইত্যাদি সংকলনও আছে। এই সব প্রকাশিত গল্প-সংগ্রহ রাকেশের জীবনকালেই ১৯৭২ সালে 'মোহন রাকেশ কী সম্পূর্ণ কহানিয়াঁ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে এই খণ্ডে অপ্রকাশিত গল্পকেও সম্মিলিত করা হয়। এখন একটা গ্রন্থেই সমগ্র গল্প পাঠ করে আমরা তার গল্পের ক্রম-বিকাশের পরিচয় সহজেই পেতে পারি।

১৯৪৪ থেকে ১৯৭২ সালের মাঝে রাকেশ মোট ছেষট্টিটি গল্প লিখেছে, যার মাঝে বারোটা তার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়নি। স্বয়ং রাকেশের লেখায়—

"আমার অধিকাংশ গল্প 'সম্পর্কের যন্ত্রণায়' নিজের একাকীত্বে বিব্রত হওয়ার কাহিনী, প্রতিটি এককের মাধ্যমে তার পরিবেশ চিত্রিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এই একাকীত্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন ব্যক্তির একাকীত্ব নয় বরং সমাজের মাঝে থাকার একাকীত্ব, এবং তার পরিণতি কোন রকমের সিনিসিজম-এ নয়, বরং সহনশীলতায় আছে। ব্যক্তি ও সমাজ কে পরস্পর বিরোধী এক-অপরের চেয়ে আলাদা এবং পরস্পরের বিচ্ছিন্ন একক না মনে করে এখানে তাদের এমনই এক অভিন্ন ভাবে দেখার প্রচেষ্টা, যেখানে ব্যক্তি সমাজের বিড়ম্বনা সমূহের এবং সমাজ ব্যক্তির যন্ত্রণা সমূহের দর্পণ।"

[সম্পূর্ণ কহানিয়াঁ, ফ্লাপ থেকে]

রাকেশের এই বক্তব্যের সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত করতে হবে, তার অধিকাংশ গল্প হল সম্পর্কের, মূখ্যত নারী-পুরুষের সম্পর্কেরই গল্প। বিংশ শতাব্দীর ছয় সাত দশকে আমাদের দেশ ও সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এক নতুন চেতনার সূচনা হয়। নারী তার নিজস্ব আলাদা অস্তিত্ব চিনতে শুরু করে, কাজকর্মের সুবাদে সে পুরুষের কাছাকাছি আসতে থাকে, নারী-পুরুষের মাঝে পরস্পর নতুন সম্পর্ক বিকশিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে বিবাহিত জীবনকে যে কোন মূল্যে অতিবাহিত করার পরম্পরাগত ভাবনার প্রতি বিদ্রোহের ভাব, সবার মাঝে থাকা সত্ত্বেও একাকিত্ব বোধ, ইত্যাদি ব্যাপার আমাদের জীবনের অঙ্গ হতে থাকে, এবং ঐ যুগে যে সকল সাহিত্যিক এই মনস্থিতি চিত্রণ করেছে, তাদের মাঝে মোহন রাকেশ অগ্রণী। তার উপন্যাস, গল্প এবং নাটক সব কিছুতেই ঘটনাবলি নারী-পুরুষের সম্পর্কের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে। আরেকটা ব্যাপার—নারী পুরুষ সম্পর্কের অন্তর্গত প্রেম, আনন্দ, পূর্ণতা, সমর্পণ ইত্যাদির চিত্রণ খুব কম হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পরের টেনশান, মন কষাকষি, শ্বাসরোধকারী বিচ্ছিন্নতা, এসবই দেখা যায়। রাকেশের চরিত্র সুখ বা আনন্দ যে পেতে চায় না, এমন নয়, পূর্ণতার কামনা যে করে না, এমন নয়; কিন্তু না সে সুখ পায়, না পায় আনন্দ, না সে নিজেকে সম্পূর্ণ তৈরী করতে পারে, না অন্য কারো মাঝে সম্পূর্ণতার সাক্ষাৎ করতে পারে — সব কিছু অর্ধেক, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; নিজের কাছেও, অন্যের কাছেও। দোরাহা, ধুঁধলা, দীপ, অপরিচিত, আদমী আউর দীওয়ার, মরুস্থল, লক্ষ্যহীন, ইন্সান কে খন্ডহর ইত্যাদি গল্পগুলি এই মনঃস্থিতির প্রমাণ।

বস্তুত, নিজের লেখায় রাকেশ তার আশেপাশের পরিবেশ কে চিত্রিত করেছে এবং সে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে নানান রূপে উদঘাটিত করেছে। তার জীবনের একটা বড় অংশ অসফল বিবাহ সম্পর্কিত দমবন্ধ অবস্থায় কেটেছে। এই সঙ্গে, হাল্কা-গভীর অনেক মধুর সম্পর্ক গড়েছে, ভেঙেছে। রাকেশের ডায়রীর পাতা এবং তার কথা-সাহিত্য (উপন্যাস-গল্প) যদি পাশাপাশি রেখে দেখা যায়, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে বহুস্থানে সে নিজের জীবনের ঘটনা, নিজের ভাবনা তার লেখায় পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। ফলস্বরূপ তার লেখায় এক ধরনের গভীরতা, অনুভূতির তীব্রতা এবং স্ব-অনুভূতি প্রসূত সৃজনের শক্তি পাওয়া যায়। এই সঙ্গে, অনেক জায়গায় এটা তার সীমাবদ্ধতার মতো মনে

হয়। চরিত্র, পরিস্থিতি এবং ভাবনা থেকে প্রাপ্ত বিস্তারিত বিবরণ এবং নিজেকে আলাদা রেখে স্বতন্ত্র রূপে চরিত্রের সৃজন করার মৌলিকতা কম দেখা যায়। এমন মনে হয়, যেন সে নিজেকে অতিক্রম করে উঠতে পারেনি, তার সৃজন তারই কাছেপিঠে জড়ো হয়ে থেমে গেছে। সে নিজে ডালহৌসী, ধরমশালা, সিমলা ইত্যাদি পাহাড়ি জায়গায় ছিল, তার উপন্যাস-কাহিনীর বহু ঘটনাস্থল পাহাড়ি-প্রদেশ। সে শহরে জীবন কাটিয়েছে, বন্ধু-বান্ধব, ঘোরা-ফেরা, হোটেল-রেঁস্তোরা, মদ্যপান, একাকীত্ব, শ্বাসকষ্ট, অসন্তোষ, মন কষাকষি, অসফল বিবাহ-সম্পর্ক ইত্যাদি তার জীবনের অঙ্গ ছিল, তার সাহিত্যেও আমরা এই সব প্রচুর মাত্রায় পাই। অনেক জায়গায় খোলাখুলি বর্ণনাও সে করেছে—তা বুকে জড়িয়ে ধরা এবং চুম্বনও হতে পারে, স্তনের বর্তুল ওঠা নামা বা বিছানায় শোয়াও হতে পারে।

রাকেশের গল্পে প্রত্যক্ষভাবে সমাজ বা সামাজিক সমস্যার চিত্রণ না-থাকার মতই। সমাজ ততখানিই এসেছে, যতটা চরিত্রের স্থূল পরিবেশ বা বিশেষ মানসিক-অবস্থার চিত্রণের জন্য প্রয়োজন ছিল। শিশু চরিত্রের প্রসঙ্গও কম দেখা গেছে। 'এক আউর জিন্দগী' এবং 'পহচান' এর মত গল্প অপবাদ স্বরূপ। বস্তুত এই দুটি গল্পই রাকেশের নিজের জীবনেরই কাহিনী। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার পর ছেলে নবনীত মার সঙ্গে থাকে। পরবর্তী সময়ে শীলা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে, এবং নবনীতকে নতুন ঘর, নতুন পরিবারে স্থানান্তরিত হতে হয়। বহুদিন ধরে নবনীতকে নিয়ে দুজনের মাঝে টানাপোড়েন চলে, রাকেশ ও নবনীত দেহরাদুন বা দিল্লীতে দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকে। পরে এই যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। উপরিউক্ত দুটি গল্পেই বর্ণিত ঘটনায় প্রথম হুবহু এমনই ঘটে ছিল। অন্য গল্পটা কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতি এমনই, নবনীত কে সেই মানসিক অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল, যার চিত্রণ 'পহচান'-এ করা হয়েছে। এই গল্প দুটিতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদে সৃষ্ট পরিবেশ এবং পরিবর্তিত পরিবেশে শিশুর ওপর প্রভাবের সমস্যাকে খুবই আন্তরিকভাবে এবং সততার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভাষা-শৈলী সহজ, সরল এবং স্পষ্ট, কোনরকম কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়না।

এই প্রসঙ্গে রাকেশের কয়েকটি বিশিষ্ট গল্পের আলোচনা করা সঙ্গত মনে হয়। প্রথমে 'মিস পাল'। সমগ্র গল্প-সংগ্রহে প্রথম গল্প, যা একাকীত্বের গল্প। মিস পাল দিল্লীর এক অফিসে কাজ করে, কিন্তু চারপাশের ক্ষুদ্রতা ও নীচতায় বিরক্ত হয়ে কুলু চলে যায় যাতে লোকেদের ভিড়-সরগরম থেকে দূরে নিরিবিলিতে থাকতে পারে। তারপর, কি ভাবে শৈশব থেকে বয়স্ক হওয়া অবধি ছোট ছোট ঘটনা মিস পালকে মাড়িয়ে চলে, তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে, নিজের মাঝে গুটিয়ে ফেলার জন্য প্ররোচিত করে, কি করে যে তাকে একেবারে একাকী করে ফেলে — বড় মর্মান্তিক বিবরণ এই দীর্ঘ গল্পে পাওয়া যায়।

একটা অন্য ধরনের একাকীত্বের গল্প হল 'খালী'। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে টেনশানপূর্ণ সম্পর্কের ফলস্বরূপ উপলব্ধজাত একাকীত্বের কাহিনী। নায়িকা তোষীর দৃষ্টিতে এই

গল্প লেখা হয়েছে, যদিও সে নিজে প্রথমপুরুষে গল্প বলে না। সে সাংঘাতিক যন্ত্রনা কষ্ট অনুভব করে, স্বামী ও কন্যা থাকা সত্ত্বেও সে ভয়ঙ্কর একাকীত্ব উপলব্ধি করে। সে এমন কিছু করার কথা ভাবে, যা নতুন, যাতে যুগল (স্বামী) ক্ষেপে ওঠে। যুগলের দৃষ্টি দিয়ে সে তখন সব কিছু দেখার চেষ্টা করে। কল্পনা করে, যে একদিন চিরকালের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলে যুগলের কেমন লাগবে? কিন্তু, কল্পনা করতে করতে তার একধরনের ধাক্কা লাগে। আমাকে বাড়িতে না দেখে, এবং আমি কখনও ফিরে আসবো না জেনে, যুগলের চোখে-মুখে কেমন হাসি ছড়িয়ে পড়বে, এই কল্পনায় সে শিহরিত হয়ে ওঠে, এখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যুগলকে হাসতে দেখা সে তখন দেখতে পারবে না। আবার সে ফিরে আসে, সংসার সামলাতে শুরু করে। গল্পের শেষটা এই রকম—

> "সে এঁটো পেয়ালা তুলে রান্নাঘরে রেখে দেয়। গুড়্ডোর বই জড়ো করে এক পাশে রেখে দেয়। ঘামে শরীর জবজবে করছিল, তাই স্নান ঘরে গিয়ে আবার একবার কলের মুখ খুলে দেয়। পাইপের ভেতর থেকে পরিচিত ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যেতে থাকে, তারপর এক-এক ফোঁটা জল নীচে পড়তে থাকে।"

গোটা গল্পে জল না থাকা, রুদ্ধশ্বাস গরম পড়া, শরীর প্যাচপ্যাচে, অবশেষে জলের ফোঁটা বেয়ে পড়া যেন আসন্ন জীবনে সামান্য ভরসার ইঙ্গিত করে, হোক না কেন তা অস্থায়ী। আজকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহুরে দাম্পত্য জীবনের এক আন্তরিক চিত্র 'খালী' গল্পে পাওয়া যায়, যা আমাদের নতুন বাসনার, আকাঙ্খার, নিরাশার এবং রূদ্ধশ্বাস জীবনের মাঝে বেঁচে থাকা জীবনের করুণ গাঁথা।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের একটা একেবারে ভিন্ন চেহারা দেখা যায় 'সুহাগিনেঁ' গল্পে। মনোরমা একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। স্কুলের কোয়ার্টারে থাকে। বিয়ে করেছে, কিন্তু স্বামী অন্য শহরে থাকে। সে ওকে চাকরি ছাড়তে দেয় না, কেননা এখনও ভাই-বোনের বিয়ে দিতে হবে। সুশীল ও মনোরমা স্থির করে, এখনও তারা সন্তান-এর জন্ম দেবে না, যাতে আয়ের বড় অংশ ভাই-বোনের দায়িত্বপূরণ করতে লাগানো যেতে পারে। মনোরমা সীমাহীন একাকীত্ব বোধ করে, জীবনের অনেক ছোট-বড় সুখ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়, নিজের দুধ-ডিমের খরচ থেকে কাট-ছাট করে ননদের জন্য শাল পাঠায়। অন্য দিকে, তার ঝি কাশী, যার স্বামী অযুধ্যা তাকে ত্যাগ করে অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকে। ন-মাসে ছ-মাসে কখনও বাড়ি আসে, কাশীকে মারধোর করে, তার কাছে সঞ্চিত টাকা-পয়সা নিয়ে চলে যায়। এবং প্রতিবার তার চলে যাবার পর কাশী গর্ভবতী হয়, আরেকটা সন্তানের মা হয়। দু-জনেই সধবা, কিছু-কিছু ব্যাপার দুই নারীর স্থিতিতে সমতাও আছে। কিন্তু সত্যি কি মনোরমা শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তেমন সুখ কি পায়, যা অশিক্ষিতা কাশী, স্বামীর হাতে প্রহৃত হয়ে পায়? অদ্ভুত এই বিড়ম্বনা। অবশ্য এই গল্পের একটা আর্থিক প্রশ্নও আছে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এই ধরনের দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূর স্বাভাবিক জীবন-যাপনকে বহুবার প্রভাবিত করে, খন্ডিত করে, এবং পারিবারিক দায়িত্বকে পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতার

ফলস্বরূপ সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে।

'কোয়ার্টার' রাকেশের আরেকটি বহু আলোচিত গল্প। আজকাল শহরে থাকার জন্য কোনো জায়গা পাওয়া কঠিন ব্যাপার, এবং সেই সঙ্গে, ভাল ও পর্যাপ্ত জায়গা পেয়ে গেলে শান্তিতে থাকাও কি কঠিন—এরই মর্মান্তিক চিত্র 'কোয়ার্টার' গল্পে অঙ্কিত করা হয়েছে। শঙ্করের চার কামরার কোয়ার্টার পাওয়া তো নয়— যেন ঝামেলা এসে হাজির। আসা, থাকা এবং জাঁকিয়ে বসার লোকেদের লাইন পড়ে যায়। আগন্তুকদের আসার কারণে বাস করার কামরাই হাতছাড়া হয় না, বরং সেই সঙ্গে শান্তিও বিঘ্নিত হয়। নানান ধরনের খরচপাতিও বেড়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অসহিষ্ণুতা চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। তাতে আগুনে ঘি-য়ের কাজ করে প্রতিবেশী মিসেস শর্মার শঙ্করের প্রতি অতিরিক্ত কোমলতা। শঙ্করের বান্ধবী মিসেস লল্লার আগমন সেই আগুনকে আরও চাগাড় দেয়। টেনশান এবং অবরুদ্ধ যন্ত্রনার মাঝে গল্প শেষ হয়। শেষ হবার পর পাঠকের মনে হয়, এর চেয়ে ভাল ছিল ছোট জায়গায় শংকর ও রাধা যদি থাকত! না, নতুন কলোনীতে আসতো! না, বড় ফ্ল্যাট হতো! না, এত ঝামেলা সমস্যাও হতো। 'পরস্ত্রীর ব্লাউজের ভেতর চোখ সেঁধিয়ে দেওয়া' বা 'ঘাম মোছার অজুহাতে বার-বার বুকের মাঝে আঙুল রেখে' এইসব উক্তি রাকেশের খুবই স্বাভাবিক, বস্তুত খোলাখুলি বর্ণনার প্রমাণ।

'অপরিচিত' নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরীয় গল্প। ট্রেনে যাওয়ার পথে এক বিবাহিত পুরুষ এবং এক বিবাহিত রমনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। রমনী তার স্বামীকে বোম্বাইয়ে ইংল্যান্ডের পথে রওনা করিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে। সঙ্গে চার মাসের মেয়ে। আলাপ-আলোচনায় দুজনেই নিজের-নিজের কথা বলে। স্বামীর সামনে স্ত্রীর মুখ খোলে না। স্বামী এতে খুবই অসন্তুষ্ট। সে বলে —'আসলে সে আমায় বুঝতে পারে না। কথা বলতে আমার ভাল লাগেনা, অথচ কেন জানি সে আমায় কথা বলার জন্য বাধ্য করে?' সেই 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং' এর অভাব, তবে বেশ কোমল স্তরে। স্ত্রী নিজেকে, নিজের ত্রুটি বোঝার চেষ্টা করে। রাত বারোটা অবধি দুজনেই কথা বলতে থাকে, মনে হয়, পরস্পরকে ভালভাবে জানে এবং বোঝে এমন দুজন পুরনো বন্ধু কথা বলছে। পুরুষ তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে তার ঘুম ভেঙে যায়, দেখে সামনের সিট শূন্য! রমনী কোন স্টেশনে নেমে পড়েছে। যাবার আগে সে পুরুষকে চাদর দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিয়ে গেছে—যাতে শুধু-কম্বলে যেন ঠান্ডা না লাগে। চাদরের উষ্ণতার সঙ্গে রমনীর অন্তরের উষ্ণতা চারদিকে ভাল করে জড়িয়ে পুরুষ পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চাপা উত্তেজনা ও অসঙ্গতি আছে, সেই সঙ্গে নারী-পুরুষের মাঝে সহজ রোমান্স ও কোমলতাও আছে। গল্পের সমাপ্তি মনকে স্পর্শ করে, স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করে তোলে।

শহুরে জীবনের বাস্তব অবস্থাকে চিত্রিত করেছে, এমন একটি গল্প হল 'এক ঠহরা হুয়া চাকু'। আজকাল কথায়-কথায় ছোরা-চাকু বার করে গুন্ডারা যা ইচ্ছে করিয়ে নেয়। চাইলেও আমরা তার প্রতিবাদ করতে পারি না, চিনতে পেরেও সনাক্ত করতে

চাই না, কেননা নিজের প্রাণের ভয় আছে। গল্পের নায়ক বরফ কেনার জন্য অটোটাকে রাস্তায় দাঁড় করায়, অন্য একজন লোক এসে জোর করে তাতে বসে পড়ে। সে প্রতিবাদ করায় লোকটা পকেট থেকে চাকু বার করে ওকে শাসায় এবং অটোঅলাকে যেতে আদেশ করে। বন্ধু এই ঘটনা শুনে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট করায়, অবশেষে গুন্ডা ধরা পড়ে এবং তাকে সনাক্ত করার জন্য নায়ককে থানায় ডাকা হয়। তখন তার মনে দ্বন্দ্ব চলে — চিনব, নাকি চিনব না? চিনে কি শেষে গুন্ডার কাছ থেকে শত্রুতা কিনব, নাকি না-চিনে নিজের জীবন সুচারুরূপে চলতে দেব? ঠিক সময়ে 'হ্যাঁ, এই লোকটাই' তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত সে ট্যাক্সীতে মুখ আড়াল করে বাড়ি ফিরে আসে। কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা আজকের জীবনে। অন্যায় দমন করতে আমরা ভয় পাই, কিন্তু প্রতিবাদ করে জীবনে বিপদ ডেকে আনি। থানার গোটা পরিবেশ এবং সেখানকার ক্রিয়া-কলাপের ফটোগ্রাফিক চিত্রণ এই গল্পের অতিরিক্ত বিশেষত্ব।

'উসকী রোটি' বাস্তব চিত্রের আরেকটি গল্প। এর পরিবেশ গ্রাম। গোটা আবহাওয়া, চরিত্র, তার মনস্থিতি এবং সমস্যা সবকিছু গাঁয়ের। নকোদর থেকে জলন্ধর যাওয়ার বাসে সপ্তাহে ছ'দিন ড্রাইভার সুচ্চা সিংহের ডিউটি। রোজ তার বিবি বালো দুটোর সময় বাড়ি থেকে রুটি এনে দেয়। একদিন তার আসতে দেরী হয়ে যায়, কারণ বাড়িতে আসা বোন জিন্দাকে সে খুঁটে আনতে পাঠালে গাঁয়ের লম্পট জঙ্গী ওর পেছনে লাগে। ফলে তার দেরী হয়ে যায়। সে যখন রুটি নিয়ে আসে, বাস ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। বালো সেখানেই রাস্তায় বাসের ফিরে-আসার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। একদিকে সময়মতো রুটি পৌঁছে দিতে না পারায় স্বামীর রাগের ভয়, অন্যদিকে বাড়িতে একা একা বসে থাকা জিন্দার নিরাপত্তার ভয়। রাত নটায় সুচ্চা সিংহ শেষ বাস নিয়ে সেখান থেকে যায়। বালো তাকে সত্যি কথা বলে না বটে, তবে তার কাছ থেকে দুটো মিঠে কথা শুনেই আশ্বস্ত হয়ে পড়ে। গোটা ভার তার বুকে লুকিয়ে রেখে সে বাসের লাল আলো দেখতে থাকে।

নারীর অসহায়তা, নিরাপত্তার অভাব, জীবনের পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নেবার বাধ্যতা ইত্যাদি মন নাড়া দেয়ার ছবি এই গল্পে পাওয়া যায়।

'ভূখে' রাকেশের একটি বড় স্নিগ্ধ ও প্রিয় গল্প। শিল্পী সত্যপাল ফ্রান্সে গেলে সেখানে এভলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় অবশেষে বিবাহে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে তারা দুজনে ভারতে ফিরে আসে। বোম্বাই এবং দিল্লীতে থেকে সত্যপাল তার কাজ জমাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সাফল্য পায় না। শেষে তার টি-বি হয়। এভলিন তাকে নিয়ে সিমলা চলে যায়, শেষ কিছুদিন যাতে সে সত্যপালের সঙ্গে নিরিবিলিতে শান্তিতে কাটাতে পারে। এই গোটা সময় তাকে ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটের মধ্যে কাটাতে হয়। পাঁচ ছ বছরের ছেলের ডিম খাওয়ার ইচ্ছেটুকুও সে পূরণ করতে পারে না। স্বামীর কয়েকটা ছবি বিক্রী করে সে কিছু টাকা পয়সা পেতে চায়, কিন্তু জীবনের তিক্তবোধ, বীভৎস বোধ এবং সংঘর্ষের রূপকল্প—সেইসব ছবি কে আর কিনবে?

লোকেরা তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলে পাঁচ দশ মিনিটের সুখ পেতে চায়, তাদের ক্ষুধা মেটাতে চায় ব্যাস। সত্যপালের মৃত্যু ঘটে। সে তখন একা ছেলেকে নিয়ে দিন কাটায়। আশা করে, কোনো একদিন স্বামীর ছবি বিক্রী হবে, এবং সে ছেলের সাধ পূরণ করবে।

এই গল্পে রাকেশ পেটের, শরীরের এবং মনের, ক্ষুধা-পীড়িত লোকদের মনের অবস্থা চিত্রিত করেছে। এভলিনের চরিত্রের দৃঢ়তা, পরাজয় স্বীকার না করার প্রবৃত্তি এবং সসম্মানে, কারো সামনে হাত না পেতে এই জীবন বেঁচে থাকার তার দৃঢ় সংকল্পের প্রভাবপূর্ণ পরিচয় 'ভূখে' গল্পে পাওয়া যায়। কোনো রমনীর এমন পরিস্থিতিতে সুযোগ-সন্ধানী 'ক্ষুধার্ত'দের বাস্তব চিত্র এই গল্পে আঁকা হয়েছে। গোটা গল্প পাঠের পর মনকে আর্দ্র করে তোলে।

রচনা-শিল্পের বিভিন্ন তত্ত্বের দৃষ্টি দিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব রাকেশের অধিকাংশ কাহিনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে। নিজের দেখা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্জাত সত্য রাকেশ তার গল্পে উপস্থাপনা করেছে। এইসব গল্পে এক সুস্পষ্ট কাহিনী আছে, গল্প এক কেন্দ্র-বিন্দু থেকে শুরু করে চরম-বিন্দু অবধি যাত্রা করে। স্বাভাবিক ভাবে এমন গল্পের চরিত্রগুলি জীবন্ত-জাগ্রত-সংবেদনশীল চরিত্র হয়, আজকের জটিলতা এবং বৈষম্যে তাদের যুঝতে হচ্ছে দেখা যায়। এই কারণেই রাকেশের অধিকাংশ গল্প আমাদের নিজেদের গল্প মনে হয়, আমরা সহজেই তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি। উসকী রোটি, সুহাগিনেঁ, অপরিচিত, মিস পাল, কোয়ার্টার ইত্যাদি গল্পই তার প্রমাণ।

রাকেশ কয়েকটা এমন গল্পও লিখেছে, ইঙ্গিতময় বা প্রতীক ধরণের, এবং যার বক্তব্য, বিষয় বা চরিত্র আমাদের বিশ্বস্ত মনে হয় না। গ্লাস ট্যাঙ্ক, জখম, ফৌলাদ কা আকাশ, ইত্যাদি গল্পগুলি এধরনের।

ভাষাগত দৃষ্টিতে রাকেশের গল্পে আমরা বৈচিত্র্য পাই। একদিকে সংস্কৃত তৎসম শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে উর্দু ও ইংরেজী মিশ্রিত ভাষা। চরিত্রের অবস্থা, পটভূমি এবং মনোবৃত্তি দেখে তার ভাষা ব্যবহারের এই আলাদা-আলাদা রূপ সঙ্গত মনে হয়। ফলস্বরূপ, একদিকে চরিত্রের পরিবেশ মুখর হয়, অন্যদিকে তার সৃষ্ট চরিত্র বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। গল্পে, প্রকৃতি ও ভাব দুটোকে ব্যক্ত করার জন্য দীর্ঘ বর্ণনাও করা হয়েছে। আবার ছোট বড় সংলাপের মাধ্যমেও পরিস্থিতিকে চিত্রিত করা হয়েছে। নাটকীয় সংলাপে সিদ্ধহস্ত রাকেশের গল্পে আমরা প্রভাবপূর্ণ নাটকীয় সংলাপ পাই। সাধারণত, সহজ ও স্পষ্ট ভাবে কথা বলা হয়েছে, তবুও কিছু কিছু জায়গায় অভিব্যক্তি বা উপস্থাপনা অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে গেছে।

'নঈ কহানী' সম্পর্কে 'বকলম-খুদ'এ বর্ণিত রাকেশের ভাবনা, ধারণা উদ্ধৃত করে তার গল্পের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করা যাক। এই ধারণা তার নিজের গল্পের পক্ষেও অনেকটা যথাযথ ও উপযুক্ত।

'নতুন গল্প অবিরত বিকাশের প্রক্রিয়ায় আছে। নিজের সময়ের আত্মাকে ঠিক ভাবে অভিব্যক্ত করার দৃষ্টিতে আজকের গল্পলেখক অবিরাম নিজেকে পুনর্গঠিত করে চলেছে। চারদিকে অনবরত পরবর্তনশীল সামাজিক রাজনীতির পটভূমিকা নিজের চেতনায় সমাহিত করে গল্পকার তার ঐ ভিত্তি-বিন্দুকে চিনতে চায়, যাতে তার নিজের রচনায় সময়ের যথাযথ প্রতিফলন করতে পারে। সেই সঙ্গে এই অন্বেষণ সেই চরিত্রের, সেই ব্যক্তিরও বটে, যে এই সময়কার—আমাদের আজকের—যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় গল্পলেখক নিজেকে এবং সময়ের সঙ্গে নিজের একাত্মবোধকে চেনার অবিরাম প্রয়াস চালায়। অভিব্যক্তির পক্ষে সে এমন চিত্রকল্প এবং প্রতীকের খোঁজে রত আছে যা সরাসরি সময়ের যথার্থ থেকে অনুস্যুত হয় এবং অস্তিত্বের সমগ্র সংঘর্ষকে সার্থক ভাবে প্রকাশ করতে পারে— এবং ভাষার সেই রূপের—যার শক্তি, স্পষ্টতা এবং সূক্ষতায় ঐ প্রতিবিম্ব এবং প্রতীকের যথাযথ ব্যবহার হতে পারে। নতুন গল্পের অদ্যাবধি প্রয়োগে এই দৃষ্টিতে কতদূর সফল হয়েছে, এর সঠিক অনুমান বিভিন্ন লেখার আলাদা-আলাদা বিশ্লেষণেই হতে পারে। বিশ্লেষণ ছাড়া প্রকাশিত যে কোন অভিমত শুধু পূর্ব-প্রসূত ধারণাকেই প্রকাশ করে এবং সেই ধারণা নিঃসন্দেহে, কখনও কোন উত্তর হয় না।'

(পৃ: ১১৯)

উপন্যাস

রাকেশের সৃজন প্রতিভার অন্য ক্ষেত্র হল উপন্যাস। রাকেশ মোট তিনটি উপন্যাস রচনা করেছে—'অন্ধেরে বন্ধ কমরে' (১৯৬১), 'ন আনেওয়ালা কল' (১৯৬৮), এবং 'অন্তরাল' (১৯৭২)। গল্পের মতই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও মুখ্যত নারী-পুরুষের সম্পর্ক অবধি সীমিত। আধুনিক বোধ, অসফল দাম্পত্য, নামহীন নতুন সম্পর্কে যুক্ত হওয়া, অতৃপ্তি, একাকীত্ব, শ্বাসরোধকারী ইত্যাদি আধুনিক জীবনের অনুভূতি ও অবস্থার চিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'অন্ধেরে বন্ধ কমরে' এবং 'অন্তরাল' এই দুটি নিশ্চিত রূপে এই মনোবৃত্তি নিয়েই লেখা হয়েছে। 'ন আনেওয়ালা কল' একটু আলাদা ধরনের। তার মুখ্য বিষয়বস্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্মোচন করার নয়। তবুও সাক্সেনা এবং শোভার প্রসঙ্গ অসফল দাম্পত্যের উপর আধারিত। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের জীবন-যাপনে জীবনের তারসাম্যহীনতাই অধিক মুখর হয়েছে। রাকেশ তার স্মার্ট ভাষায় এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রভাবপূর্ণ ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছে।

'অন্ধেরে বন্ধ কমরে' উপন্যাসে হরবন্স-এর লন্ডন যাওয়া, পরে নীলিমার সঙ্গে সেখানে থাকার প্রসঙ্গ, হরবন্স এবং নীলিমার মুখ দিয়ে বলা হয়েছে। এ রকমই 'অন্তরাল'-এ এক দীর্ঘ প্রসঙ্গ ভাবিকাশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, যখন শ্যামা ভাবে, কুমার এলে পর তার সঙ্গে কি কি কথা বলবে, কিভাবে বলবে, কুমার কি বলবে ইত্যাদি

চিন্তা করে এবং প্রতীক্ষা করে। রাকেশ খুব সুন্দরভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। যে কোন ব্যক্তি আলাদা-একাকী হওয়া সত্ত্বেও, না অতীত থেকে মুক্ত হতে পারে, না ভবিষ্যতের কল্পনা থেকে। এই তথ্যকে একজন কুশলী শিল্পীর মত সে তার উপন্যাসে সাজিয়েছে।

> 'ভূমিকায় কি হওয়া উচিৎ। উপন্যাসের পরিচয়? নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ? যদি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ ভূমিকায় করতে হয়, তাহলে উপন্যাস লেখার প্রয়োজন কিসের?
>
> এবং যতদূর পরিচয়ের প্রশ্ন, আমি ভেবেচিন্তে ঠিক করতে পারছি না একে কি বলব? আজকের দিল্লীর রেখাচিত্র? জার্নালিস্ট মধুসূদনের আত্মকাহিনী? হরবন্স ও নীলিমার অর্ন্তদ্বন্দ্বের কাহিনী?
>
> বাতাসে কোথাও একটি কোহিনুর ঝিকিমিকি করে....'
>
> সেই কোহিনুরের গল্প?
>
> সত্যি, ভেবে ঠিক করতে পারছি না। পড়ার পর আপনি যা স্থির করবেন, সেটাই ঠিক হবে। আর যদি আপনিও কিছু স্থির করতে না পারেন, তাহলে এই সমস্যা অন্য কারো জন্য ফেলে রেখে আমার মতো আলাদা হয়ে থাকুন।

'অন্ধেরে বন্ধ কমরে' উপন্যাসের ভূমিকার লিখিত উপরিউক্ত বাক্য উপন্যাসের বিষয় বস্তু এবং রাকেশের মানসিক অবস্থা দুটোরই প্রকাশ করে। 'অন্ধেরে বন্ধ কমরে' রাকেশের প্রথম উপন্যাস, প্রকাশ কাল ১৯৬১। রাকেশের এই উক্তির সারমর্ম—সে নিজেই স্থির করতে পারছে না যে একে 'আজকের দিল্লীর রেখাচিত্র' বলবে, নাকি, 'মধুসূদনের আত্মকাহিনী' বা 'হরবন্স ও নীলিমার অর্ন্তদ্বন্দ্বের কাহিনী বলবে। অর্থাৎ এই কথাগুলি প্রমাণ করে যে উপন্যাসে এই তিনটি কথাই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন একটার উপরে বিশেষ মহত্ব দেয়া স্বয়ং লেখকের পক্ষে কঠিন ছিল। উপন্যাসের পরিবেশ দিল্লী। দিল্লীতে বাস করে এমন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি পরিবারের জীবন-যাপন এবং সমস্যা চিত্রণের সঙ্গে সাংবাদিকতা, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করা লোকেদের মনোবৃত্তির বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সবই অপেক্ষাকৃত গৌণ, মুখ্য হল হরবন্স ও নীলিমার অর্ন্তদ্বন্দ্বের কাহিনী। মধুসূদনকে বস্তুত এই দুজনের মানসিক অবস্থা উন্মোচন করার মাধ্যম রূপেই অধিক মহত্বপূর্ণ মনে হয়। সত্যি বলতে কি, তার কসসাবপুরার জীবন, সংবাদপত্র দপ্তরে চাকরি বা পরবর্তীকালে সুষমা শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপার উপন্যাসে তেমন বিশেষ গুরুত্ব পায় না। যদিও উপন্যাস উত্তমপুরুষে লেখা হয়েছে, মধুসূদন 'আমি' দিয়ে শুরু করে, এবং 'আমি' দিয়ে শেষ করে, তা সত্ত্বেও তার 'আমি' সাধনমাত্র, মুখ্য ব্যাপার হলো, তার মাধ্যমে হরবন্স ও নীলিমা সম্পর্কের গল্প—এমন সম্পর্ক যা গড়ে ওঠেনা বা ভেঙে যায় না, যা থেকে অসহ্য শ্বাসকষ্ট দুজনেই অনুভব করে এবং যা থেকে মুক্তির পথ

ধরেও দুজনে মুক্ত হতে পারে না, আবার ফিরে এসে এক-অপরের কাছাকাছি হয়। মনে হয়, তীব্র অসন্তোষ, শ্বাসকষ্ট, নিঃসঙ্গতা বোধ. তিক্ত অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে গভীর সম্পর্কের মাঝে বেঁচে থাকতে দুজনেই অভিশপ্ত। সাংবাদিক মধুসূদনের পরিচয় হয় হরবন্স ও নীলিমার সঙ্গে, পরে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপায়িত হয়। দুজনেই নিজের-নিজের কথা নিঃসঙ্কোচে বলে। হরবন্স একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতার ব্যক্তি, সে তার আশেপাশে সব কিছু নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করতে চায়। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু হলেই সে ক্ষেপে ওঠে, তিক্ত হয়, বরদাস্ত করতে পারে না। সে মূলত দুর্বল ব্যক্তি, নিজের নির্ণয়ে দৃঢ় থাকা তার পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

নীলিমার কাছ থেকে সে দূরে সরে থাকতে চায়, মনে মনে তাই স্থির করে লন্ডন চলে যায়। কিন্তু সেখানে তিনমাসের ভেতর ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে থাকে, ফলে এক বছরের মধ্যে নীলিমাকে সে ডেকে নেয়। নীলিমাকে অপেক্ষাকৃত স্থিতধী ও দৃঢ় মনে হয়। সে অনেক ভাবনাচিন্তা করে লন্ডনে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার পরে-পরেই সেই টানাপোড়েন, কটূক্তির দেয়া-নেয়া। সেখানে সে নাচের প্র্যাক্টিস করে, উমা দত্তের দলের সঙ্গে য়ুরোপ ভ্রমণও করে। হরবন্সের সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া-ঝাঁটি চলে। একবার সে প্যারিসে থেকে যায়, ও তার প্রতি অনুরক্ত জনৈক বর্মী ব্যক্তির সঙ্গে জীবন কাটাবে বলে স্থির করে। কিন্তু, তার মন সম্পূর্ণ ভাবে এই অবস্থায় সায় দেয় না, আকস্মিক ভাবে সে প্রেমিকের বাহুপাশ থেকে বেরিয়ে প্যারিস থেকে সোজা লন্ডনে ফিরে আসে। হরবন্সকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। নয় বছর পর আবার তারা স্বদেশে ফিরে আসে, জীবন সেই ভাবেই অতিবাহিত হতে থাকে। যখন-তখন হরবন্স বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এবং যখন-তখন নীলিমাও। আবার সে নিজে থেকে ফিরে আসে, অথবা তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। জীবন আবার সেরকমই গড়িয়ে চলে, থামে, ঘষটায়, হোঁচট খায়, ভাঙে, ছড়িয়ে পড়ে।

হরবন্স ও নীলিমা বস্তুত স্বাধীনতার পর উঠে আসা সেই যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা নতুন কিছু করতে চায়, সমান হওয়ার দাবী করে, অথচ কোথাও পুরনো সংস্কারে বাধা পায়, নিজের অহম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সে নিজেই আহত হয়ে পড়ে, ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে। নীলিমা সেই সচেতন নারীর প্রতীক, যার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে, যে সৃজনের স্তরে নিজের আলাদা একটা স্থান করেছে, যার একটা বৈশিষ্ট আছে, যে স্বামীর উল্টোপাল্টা দাবী পূরণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু পরিণাম ভয়ঙ্কর শ্বাসকষ্ট এবং টেনশান, জীবনে কোথাও সুখ নেই শান্তি নেই। মনে হয়, জীবন যেন 'অন্ধকার বন্ধ কামরায়' শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে, হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে।

উপন্যাসের কিছু প্রসঙ্গ অপ্রয়োজনে দীর্ঘ হয়ে গেছে—সংবাদপত্র দপ্তরের পরিবেশ

ও কথাবার্তা, নীলিমার নৃত্য প্রদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত পার্টিতে নানান কথাবার্তা, এবং মধুসূদন ও সুষমা শ্রীবাস্তবের প্রসঙ্গ। এ সবই আজকের শহুরে জীবনের আন্তরিক চিত্র ফুটিয়ে তোলে, —তবুও এর অধিকাংশ ওপর-ওপর, অর্থহীন মনে হয়।

সব মিলিয়ে 'অন্ধেরে বন্ধ কমরে' কে আধুনিকও রক্ষণশীল দ্বন্দ্বের উপন্যাস বলতে পারি, যা আমাদের আজকের দাম্পত্য জীবনের রিক্ততা ও তিক্ততা উপস্থিত করে। তাতে অবদমন এবং বাইরের মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির অন্তরের চিত্র পাওয়া যায়।

'ন আনেওয়ালা কল' রাকেশের দ্বিতীয় উপন্যাস, যা ১৯৬৮ প্রকাশিত হয়। এটা অপেক্ষাকৃত ছোট উপন্যাস। পাহাড়ি প্রদেশে এক মিশনরী স্কুলে কাজ করা জনৈক হিন্দি শিক্ষকের ত্যাগপত্র দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। স্কুলের পরিবেশ, সেখানকার রাজনীতি, লোকেদের ছোট-ছোট পৃথিবী, বড় বড় সমস্যাদি চিত্রিত করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তার টেনশান এখানেও পরিলক্ষিত হয়। নায়ক সাক্সেনার স্ত্রী অকস্মাৎ তাকে ছেড়ে তার প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়ি যাওয়া স্থির করে, এবং চলেও যায়। খুব একটা স্পষ্ট কারণ নয়, তবু দুজনে পরস্পরের প্রতি বিচ্ছিন্ন মনে হয়। কোথাও যুক্ত নয়। অসফল দাম্পত্যের এটি আরেকটি উপন্যাস, যদিও তা এই উপন্যাসের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু নয়।

'অন্তরাল' রাকেশের শেষ উপন্যাস, প্রকাশকাল, ১৯৭২। বিষয়বস্তু শ্যামা ও কুমারকে কেন্দ্র করে। শ্যামা বিধবা, তার একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। জামাইবাবুর বাসায় আসার পর কুমারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। দুজনের মাঝে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। কুমার তার ভালবাসার কথা শ্যামাকে জানায়। শ্যামা ফিরে যায়। কয়েক বছর পর বোম্বাইয়ে আবার তাদের দেখা হয়। দুজনে আবার এক-অপরের কাছাকাছি আসে। দু বছর আগে কুমার বিয়ে করেছে, কিন্তু সুখী নয়। একদিন কুমারের ফ্ল্যাটে শ্যামা আসে। দুজনে খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, তবুও কিছু একটা আছে, যা শ্যামাকে বাধা দেয়। মৃত স্বামীর কথা সে সর্বদা স্মরণ করে, ভুলতে পারে না। সে আবার কুমারের কাছ থেকে দূরে চাকরিতে ফিরে যাওয়া স্থির করে।

শ্যামা ও কুমারের সম্পর্ক এমন, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। দুজনের মনের অন্তস্থলে শূন্যতাবোধ—শ্যামার মনে তার স্বামীর জন্য এবং কুমারের মনে শীর্ণ-দূর্বল-হলদেটে মেয়েটির জন্য, যাকে সে কোনো সময় বিয়ে করতে চেয়েছিল। তারা দুজনেই পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে ঐ শূন্য কোটর পূর্ণ করার জন্য। অথচ ঐ শূন্য কোটরের কারণেই তারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করতে পারে না।

'অন্তরাল'-এ আজকের জটিল মানসিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া, এই উপন্যাসও মূলত নারী-পুরুষের সম্পর্কেরই উপন্যাস। সম্পর্ক— যা উন্মোচনের দাবী করে। সেই সঙ্গে, যা কোথাও সংস্কারে জড়িয়েও থাকে। সম্পর্ক, যার কোন নাম

দেয়া কঠিন ব্যাপার, তা সত্ত্বেও যা ব্যক্তির পক্ষে খুবই মহত্ত্বপূর্ণ।

রাকেশের উপন্যাসকে আমরা যদি প্রথম শ্রেণীর রচনা হিসেবে স্বীকার নাও করি, তার রচিত কাহিনী, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদিকে আমরা শেষের দিকে স্থান দিই না কেন, তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, এই সকল রচনায় আজকের শহুরে জীবন, আধুনিক বোধের সঙ্গে বেঁচে থাকা নারী-পুরুষ, তাদের মনে গুমরে ওঠা দ্বন্দ্ব, টেনশান, নিঃসঙ্গবোধ ইত্যাদি খুবই মর্মভেদী চিত্রিত হয়েছে। এবং জীবনেরই এক তিক্ত বাস্তবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ, বা আলাপ ঘটে।

নাটক এবং একাঙ্কিকা

১২.৯.৬৪ ডায়রীতে রাকেশ একটা কৌতুকের কথা উল্লেখ করেছে—

"কাল—শরদ দেওড়া আর রাজেন্দ্রর বাড়িতে মার্কণ্ডেয়র চিঠি। টেরেসে, চা, এবং রাজেন্দ্রর লজিকে সৃষ্ট একটা গপ্পো—

'....তাহলে গল্পকার মোট তিনজন?'

সে হাত ধরে ঝাঁকায়

'ঔপন্যাসিক দুজন?'

সে আবার হাত ধরে ঝাঁকায়।

'আর নাট্যকার শুধু একজন?'

সে হাত সরিয়ে নেয়। বলে—দুশশালা, কোত্থেকে কথা বার করে এনেছে।"

বক্তা-শ্রোতার তাৎপর্য হল, গল্পকার তিন জন। অর্থাৎ রাজেন্দ্র যাদব, মোহন রাকেশ এবং কমলেশ্বর। ঔপন্যাসিক দুজন অর্থাৎ রাজেন্দ্র যাদব এবং মোহন রাকেশ। নাট্যকার একজন অর্থাৎ মোহন রাকেশ। কৌতুক হিসেবে বলা এই ব্যাপারটা বস্তুত অবস্থার সততা স্বীকার করা হয়েছিল। ছয় আর সাত দশকে মোহন রাকেশ, রাজেন্দ্র যাদব এবং কমলেশ্বর নতুন গল্প আন্দোলনে সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ সমর্থক এবং শক্তিমান সৃষ্টিশীল হিসেব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তিনজনেই স্বাধীনতা-পূর্ব প্রেমচন্দ্র যুগে এবং তার পরবর্তীকালের গল্পে নতুন এক মাত্রা আনে, নতুন পরিচয় তুলে ধরে। বিষয় বস্তু অভিব্যক্তি এবং ভাষা সর্বস্তরে গল্পকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার মহত্ত্বপূর্ণ কাজ এই তিনজন করে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন ভাব-বোধ উজ্জীবিত করার ব্যাপারে রাজেন্দ্র যাদব এবং মোহন রাকেশ অগ্রণী ছিল। যদিও এই যুগে অজ্ঞেয়, জৈনেন্দ্র, যশপাল, অমৃতলাল নাগর, ফনীশ্বরনাথ রেণু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের মহত্ত্বপূর্ণ রচনা দ্বারা হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছিলেন, তথাপি আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের বিষমতা, দ্বন্দ্ব, একাকীত্ব, দাম্পত্য জীবনের পরিবর্তিত স্বরূপের আধুনিক ভাব-বোধে সমন্বিত চিত্র রাজেন্দ্র যাদব এবং মোহন রাকেশের উপন্যাসে যেমন পাওয়া যায়, তেমন অন্য লেখকদের রচনায় নয়। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে রাকেশ একাই আসন জুড়ে থাকে। তার প্রথম নাটক 'আষাঢ় কা একদিন'-এর রচনা ১৯৫৮ সালে। এর মাঝে অন্য কোনো নাট্যকার

তেমন গরিমা পায়নি, যা রাকেশ সহজেই পেয়েছিল। ১৯৫৯ সালে তার প্রথম রচনা সঙ্গীত নাটক অকাদেমির প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিল। রাকেশ তাঁর জীবদ্দশায় তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, 'আষাঢ় কা এক দিন' (১৯৫৮), 'লহরোঁ কে রাজহংস' (১৯৬৩), এবং 'আধে অধূরে' (১৯৬৯) লেখে, কয়েকটা একাঙ্কিকা (ধ্বনিনাট্য), শ্রুতিনাটক, বীজ নাটক এবং রেডিয়ো নাটক ইত্যাদি লেখে,. যা 'আন্ডে কে ছিলকে, অন্য একাঙ্কী তথা বীজ নাটক' এবং 'রাত বীতনে তক তথা অন্য ধ্বনি নাটক' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি নাটক 'পৈর তলে কী জমীন' কে সে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে গেছে, যা পরবর্তীকালে তার নোটিং এর ভিত্তিতে তার অনন্য বন্ধু কমলেশ্বর সম্পূর্ণ করে। রাকেশের এই সকল রচনা স্বতন্ত্ররূপে বিশ্লেষণ করার পূর্বে এটা প্রয়োজন, যে আমরা ঐ সামান্য বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করি যা রাকেশের সম্পূর্ণ নাট্য-সাহিত্যে পাওয়া যায়, এবং যা তাকে শুধু হিন্দিতেই নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করে তোলে,

'লেখকের বাস্তবিক কমিটমেন্ট কোন বিশেষ বিচার—
ভাবনার সঙ্গে না হয়ে নিজের সঙ্গে, নিজের সময়ের
সঙ্গে এবং জীবনের সঙ্গে হয়ে থাকে।'

[বকলম খুদ, পৃ: ১১২]

রাকেশের এই উক্তিতে গভীর বিশ্বাস ছিল, এবং তার সমগ্র সাহিত্য এর প্রমাণ। রাকেশ তার যুগ, আশেপাশের বাতাবরণ ও সমস্যার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিল, তা সে উপলব্ধি করেছিল এবং সেই অভিজ্ঞতাজনিত সত্য কে সে সাহিত্যে বানী দেয়। বস্তুত রাকেশের সত্য তার যুগের সত্য ছিল, সাহিত্যের সত্য ছিল, তার আশেপাশের জীবনের সত্য ছিল, নারী-পুরুষের বিভিন্ন সম্পর্কে উদ্ভাসিত নতুন চেতনা, দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতার সত্য ছিল, যা সে তার নানান রচনায় বারবার উন্মোচন করেছে। 'আষাঢ় কা একদিন'-এ যখন সে রাজকীয় সম্মান এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বন্দ্বের কথা বলে, সুখ-সুবিধা ভরা জীবনে সৃজনের কুণ্ঠিত হওয়ার কথা বলে, তখন অবশ্যই সে নিজের যুগের সেই ভয়কেও মুখর করে, যা সাহিত্যেকদের রাজকীয় সম্মানের লোভে শাসকদের চাটুকার হওয়ায় প্রেরিত করতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজধানী থেকে আগত কর্মচারী, রঙ্গিনী-সঙ্গিনী এবং রাজমহিষী প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীর মনোবৃত্তিও আজকের রাজকর্মচারী, শিল্প কলার ছাত্র এবং শাসকদের মনোবৃত্তিকে প্রতিফলিত করে, যা কখনও অর্থহীন তর্ক ও বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। কখনও গৌণ মহত্ত্বের বস্তুতে হারিয়ে যায়, কখনও বা সব কিছু সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বন্দ্ব এবং জীবনে বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারার অক্ষমতার চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। অবশ্য, সব ব্যাপারই মুখ্যত আজকের যুগের, এবং এই সব অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে সমস্যার ব্যাপ্তি প্রকাশ করার সকল প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

'লহরোঁ কে রাজহংস' নাটকেও আজকের যুগ প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে। এখানে সমস্যা হল নারী-পুরুষের সম্পর্কের দুজনের অহংকারের দ্বন্দ্ব,

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের, এক-অপরকে নিজের কথা বোঝাতে না পারার অসামর্থ্যের দ্বন্দ্ব। এই নাটকে ব্যক্তির নিঃসঙ্গতাবোধ, আন্তরিক সংঘর্ষ, ট্রান্সমিট না করতে পারার যন্ত্রণা, ইত্যাদি অধিক ঘনীভূত হয়ে এসেছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের অনুকূলে নিজেকে সঁপে না দিতে পারার অসহায়তা, সমর্পণ এবং সমঝোতার স্থানে নিজের ইচ্ছে এবং অহমিকা কে সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ মানার জেদ আধুনিক, বিংশ শতাব্দীর। ১৯৬৯ প্রকাশিত 'আধে-অধূরে' নাটকেও এই নারী-পুরুষের অহমিকার দ্বন্দ্ব, টেনশান, শ্বাসকষ্ট এবং শৃঙ্খলাহীনতাকে প্রকাশ করে, তবে অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে কেবল নারী-পুরুষই ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে না, তাদের সঙ্গে গোটা পরিবার ভেঙে-ছড়িয়ে পড়ে। এই নাটকে রাকেশ প্রথম সমকালীন পরিবেশে চরিত্রসমূহ রেখে সমকালীন সমস্যা চিত্রিত করেছে। ব্যাপারটা এখানেও ভেঙেপড়া সম্পর্কের, কিন্তু ভিন্ন রূপে, ভিন্ন স্তরে। আধুনিক পরিবেশে নিজেদের জীবন এবং নিজস্ব সমস্যার এমন নির্মম ও তিক্ত সাক্ষাৎকার খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। 'আধে অধূরে' রাকেশের শ্রেষ্ঠতম রচনা। হিন্দি নাট্য শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এক মহত্বপূর্ণ সৃষ্টি হওয়ার গৌরব লাভ করেছে -।

'পৈর তলে কী জমীন' আধুনিক জীবনের অসঙ্গতি, অবসাদ এবং দমবন্ধ অবস্থান কেন্দ্র করে লেখা নাটক। এই নাটকের মূল প্রবৃত্তি হল অস্তিত্ববাদ, পরিবেশ হল বাড়ির বাইরে কাশ্মীরে একটি টুরিস্ট ক্লাব। চরিত্র সব আলাদা আলাদা, অথচ নিয়তি তাদের একদিনের জন্য এক স্থানে হাজির করেছে। আকস্মিক ভাবে ভয়ঙ্কর বন্যা হওয়ার ফলে শহরের সঙ্গে যুক্ত সেতু ভেঙে যায় এবং বাইরের পৃথিবী থেকে টুরিস্ট ক্লাবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় সেইসব চরিত্রেদের পরিবর্তিত মনোবৃত্তির খুব সুন্দর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও চিত্রণ করেছে রাকেশ। কয়েক ঘন্টা পরে বন্যার জল কমে যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, টেলিফোনের রিং বেজে ওঠে, জীবনে বেঁচে থাকার আশ্বাস পাওয়া যায়, সকলেই আবার আগের মানসিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রাকেশ এই নাটক তার জীবদ্দশায় সমাপ্ত করতে পারে নি। যেদিন তার মৃত্যু ঘটে, সেদিনও সে এই নাটকে কাজ করেছিল, টাইপরাইটারে আঁটা পাতায় এরই সংলাপ লেখা চলেছিল। তার মৃত্যুর পর, তার ডায়রীতে পাওয়া নোটস্-এর ভিত্তিতে তার প্রিয় বন্ধু কমলেশ্বর নাটকটি শেষ করে। প্রথম অংশ রাকেশ নিজেই লিখে ছিল, দ্বিতীয় অংশের লেখা কমলেশ্বরের। তবে বলা বেশ শক্ত, রাকেশ নিজে এই নাটক সমাপ্ত করলে এর স্বরূপ কি হতো! ভাষা নিয়ে রাকেশ যে কাজ করছিল, তা সে নিজের অধুনাতম নাটকে কেমন প্রয়োগ করত, কি ভাবে প্রয়োগ করত, জানা নেই। নাটকটি যেমন হয়ে উঠেছে, তাতে তা বিশেষ কোন প্রভাব ফেলে না। কোথাও কোথাও মঞ্চস্থ হয়েছে তবুও তা প্রভাবহীন থাকে।

'আষাঢ় কা একদিন' 'লহরোঁ কে রাজহংস' এবং 'আধে অধূরে' কে একসঙ্গে বিচার করে দেখলে তিনটের নারী-পুরুষের সম্পর্ক এক ধরনের মনে হয়, আবার

কিছুকিছু ব্যাপারে আলাদা ধরনের। এগুলি পরস্পর ক্রম-বিকাশ বলাটা ঠিক হবে না, তবুও সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'আষাঢ় কা একদিন' এর মল্লিকা এবং কালিদাসের সম্পর্ক খুবই মধুর, আন্তরিক ভাবনার স্তরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মল্লিকা, 'ভাবনায় ভাবনার বরণ পাঠিয়ে' কথা বলে, কালিদাসের উন্নতি হোক, এই উদ্দেশ্যে তাকে রাজধানী পাঠিয়ে দেয়া হয়, ফিরে আসার পরেও তাকে স্বীকার করার জন্য তৈরী থাকে, কিন্তু তার তিক্ত বাস্তবতা কালিদাসের সহ্য হয় না। সে চলে যায়। পীড়া ও যন্ত্রণা নিয়ে। মল্লিকা তো বিগলিত থাকেই। 'লহরোঁ কে রাজহংস' নাটকে নন্দ ও সুন্দরী বিবাহিত, তাদের মাঝে মানসিক উদ্বেগ আছে, অহংবোধ আছে, পরস্পরের ভুল-ত্রুটি জানা আছে, পরস্পরকে বুঝতে না পারার মানসিক স্থিতি আছে, পরস্পরের প্রতি কুট ও তিক্ত ভাব আছে। তৃতীয় অঙ্কে নন্দ ও সুন্দরী দুজনেই পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে আত্মতোষ পায়। নন্দ বাড়িতে থাকতে পারে না, সুন্দরী তাকে ধরে রাখতে পারে না। 'আষাঢ় কা একদিন'-এর মত 'লহরোঁ কে রাজহংস' এর নায়ক-নায়িকাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তীব্র তিক্ততা, অসন্তোষ এবং পরাজয়ের ভাবনা নিয়ে। মনে হয়, তাদের নিয়তি যেন স্থির হয়ে আছে, তারা কখনও সুখ ও পূর্ণতার অনুভব করতে পারে না। 'আধে অধূরে' আরও এক ধাপ এগিয়ে, এর নায়ক-নায়িকা শুধু বিবাহিত-ই নয়, তাদের সন্তান-সন্ততি আছে। পাঁচ জন লোকের এই পরিবারের অবস্থা আরও খারাপ। বিচ্ছিন্নতা, শ্বাসকষ্ট, পীড়া, তিক্ততা এই বেশী যে তা থেকে কারো মুক্তি নেই—না মাঝবয়সী মহেন্দ্রনাথের, না কিশোরী কিন্নীর। নাটকের গোড়ায় যে খিটিমিটি শুরু হয় তা শেষাবধি চলে। মনে হয়, যেন এই পরিবারের সব লোকেরাই অভিশাপগ্রস্ত, অসন্তোষ এবং শ্বাসকষ্টে দিন কাটানোর জন্য। কালিদাস ও নন্দ পরে কখনও মল্লিকা ও সুন্দরীর কাছে ফিরে এসেছে কিনা জানা নেই, কিন্তু মহেন্দ্র সাবিত্রীর কাছে ফিরে এসেছিল—তেমন ভাবেই যেমন প্রায় না-আসার অভিলাষে গিয়ে ফিরে আসে। রাকেশ তার সব নাটকে এমন পরিবেশ দাঁড় করিয়েছে, এমন চরিত্র বেছে নিয়েছে যারা অসফল প্রেম বা অসন্তুষ্ট দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছে, যারা কখনও পূর্ণতা অনুভব করে না, আনন্দ প্রাপ্ত হয় না।

রাকেশের তিনটে নাটকের নারী-চরিত্র পর্যাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুবার এও বলা হয়েছে যে এই নাটকগুলি নারী-প্রধান। স্ত্রী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র দুর্বল, সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত। কলিদাস, নন্দ এবং মহেন্দ্রনাথ তিনজনেই এর প্রমাণ। এরা ঘরে ও বাইরে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করে কাটায় -। তুলনায় মল্লিকা সুন্দরী এবং সাবিত্রী বড় বেশী সমভার এবং গোছানো, তাদের যা করতে হবে, বা তারা যা চায় সেই সম্পর্কে তারা নিশ্চিত। যদিও তিনটি চরিত্রের অবস্থিতি এবং মনোবৃত্তিতে পর্যাপ্ত তফাৎ আছে, তা সত্ত্বেও চরিত্রের এই একধরনের মিল তিনটির মাঝেই আছে। মল্লিকা যখন কালিদাসকে পাঠায়, তখন সে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত; নিঃসঙ্গতা এবং ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। সুন্দরী যদিও নন্দের আচরণের প্রতি ততখানি আশ্বস্ত নয়, তবুও সে নন্দকে

নিজের আকর্ষণে বেঁধে রাখতে চায়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত। সাবিত্রীও যা কিছু করে, মনে মনে স্থির করেই করে। তা সফল হোক বা না হোক, সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিন্তু তার মাঝে দ্বিধা বা সংশয় নেই। অথচ তিনজনের মানসিক স্থিতি ভিন্ন ধরণের। মল্লিকা তার 'ভাবনা কক্ষ' কে কখনও শূন্য হতে দেয় নি, কালিদাস সেখানে সবসময় উপস্থিত ছিল এবং মল্লিকার শেষ নিঃশ্বাস অবধি হয়তো ছিল। কালিদাসের চলে যাওয়া সত্ত্বেও তার নৈকট্যের অনুভব সবসময় করেছে, তার জন্য কালিদাসের মনে যে কোমলতা ও আকর্ষণ ছিল, তার অনুভূতি তাকে সর্বদা পূর্ণতার অনুভব করিয়ে রেখেছে। সুন্দরী অবশ্য নন্দের প্রতি কখনও আশ্বস্ত থাকতে পারে নি। নন্দ যখন কাছে ছিল তখনও তার মনে সব সময় ভয় ছিল এই বুঝি সে অপরের (যশোধরার বা বুদ্ধের) প্রভাবে পড়ে। এই ভয়ই সম্ভবত তাকে কখনও সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ বা গ্রহণের সুখ উপলব্ধি করতে দেয়নি। নন্দ চলে যায়—আর কখনও ফিরবে না বলে।/যদি সে ফিরে আসত, তবুও কি সুন্দরীর অহমিকার তুষ্টি ছাড়া দুজনের সম্পর্কে কোনো তফাৎ হত কি? হয়তো নয়। দুজনেই ততটুটা ব্যবধানে থাকত যতটা সবসময় ছিল।

'আধে অধূরের' সাবিত্রী, অসন্তোষ এবং তিক্ততার মূর্তিরূপ। হয়তো পরিস্থিতি তাকে কিছুটা এমন হতে বাধ্য করেছে, তবুও স্বভাবেও সে ছিল এই রকমই। হতে পারে তার ও মহেন্দ্রেনাথের মাঝে কোন এক সময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল, দুজনেই এক অপরের নৈকট্য কামনা করে থাকতে পারে, জানা নেই। নাটকের নানান পরিস্থিতি ও চরিত্রের মাধ্যমে তার সম্পর্কের তিক্ততাই সামনে এসেছে। পূর্ববর্তী নায়কদের চেয়ে আলাদা, মহেন্দ্রনাথ নাটকের শেষে বাড়ি ফিরে আসে, কিন্তু তাতে কি কোনো তফাৎ হয়? দুজনের সম্পর্ক সেরকম তিক্তই, দুজনে সেরকমই দমবন্ধ করা জীবন অতিবাহিত করে। অবশ্য নাটকের শুরুতেই কালো কোট পরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমে রাকেশ বলেছে, 'এই পরিবারের স্ত্রীর স্থানে কোনো অপর স্ত্রী আলাদা ভাবে হয়তো আমাকে বিরক্ত করত, বা সেই স্ত্রী আমার ভূমিকা গ্রহণ করত, আর আমি তার ভূমিকা নিয়ে তাকে বিরক্ত করতাম।' যেহেতু সে নারীকেই কেন্দ্রে রেখেছে তাই এটা স্বীকার করা সঙ্গত বলে মনে হয়, যে তা পক্ষে এই তুলনা অধিক মহত্বপূর্ণ।

শিল্প ও ভাষার দৃষ্টিতেও কিছু সাধারণ তত্ত্ব দেখা যায়। তিনটেতেই একই দৃশ্যবন্ধের ব্যবহার করা হয়েছে। 'আষাঢ় কা এক্কদিন' নাটকের তিন অঙ্কে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়। কিন্তু 'লহরোঁ কে রাজহংস' এবং 'আধো অধূরে' তে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা। সময় অতিবাহিত হয়, এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল এই যে, স্থান এবং সময়ে অন্বয়ের দিকে রাকেশের পূর্ণ মনোযোগ ছিল, এবং সে যথাসম্ভব তা টিকিয়ে রাখার প্রয়াস করেছে। মঞ্চ-নির্মিতি রাকেশের দৃষ্টিতে থাকত,তাই গোটা নাটকে দৃশ্য-সংযোজনা এবং ক্রিয়াকলাপ সে এমন ভাবে সংযোজিত করত, যা সহজেই মঞ্চে উপস্থিত করা যেতে পারে। এমনিতে সে দু'একটা অসঙ্গত বিধানও করে বসেছে, যেমন 'আষাঢ় কা একদিন'-এ মঞ্চের ওপর মৃগশাবক নিয়ে আসা ব্যবহারিক, কিন্তু একে নিয়ে পর্যাপ্ত অসুবিধেও

হয়। এ রকমই সুন্দরীর শয়নকক্ষে ভিক্ষু আনন্দের আগমনও খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়। তা সত্ত্বেও 'আধে অধূরে' তে এ ধরনের কোনো অসঙ্গতি নেই। এই প্রসঙ্গে রাকেশের স্মার্ট চোস্ত সংলাপের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তিনটে নাটকে দারুণ মার্জিত ভাষা এবং চোস্ত সংলাপের প্রয়োগ রাকেশ করেছে। 'আষাঢ় কা একদিন' এবং 'লহরোঁ কে রাজহংস' এর পটভূমি ঐতিহাসিক হওয়ার দরুণ তার ভাষা সংস্কৃতনিষ্ঠ, যা বাতাবরণ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। সংস্কৃতনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ভাষা দুর্বোধ্য নয়। কয়েকটি শব্দ বাদে উপসংহার সাধারণ লোকেদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। রাকেশ এক একটি শব্দ ওজন করে প্রয়োগ করত, ফলস্বরূপ তার সংলাপে অর্থহীন শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, কাট-ছাটের প্রয়োজন একেবারেই বোধ হয় না। বারবার সংশোধন করার ফলে রাকেশের নাটকে কোথাও পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। কোনও অবস্থা বা ভাব প্রকাশ করার জন্য যতটা কথার প্রয়োজন, ঠিক ততটাই বলা হয়েছে। আমার ধারণা, এমন সুগঠিত নাট্যস্থিতি এবং চোস্ত সংলাপ অন্য কোনো নাট্যরচনায় আমরা পাই না।

তিনটে নাটকের শেষ অংশে নায়ক ও নায়িকার দীর্ঘ সংলাপ আছে, তা স্বগতোক্তি হোক, বা দুটি চরিত্রের কথপোকথনের মাধ্যমে হোক। 'আষাঢ় কা একদিন'-এ মল্লিকার দীর্ঘ স্বগতোক্তি এবং 'লহরোঁ কে রাজহংস'এ নন্দের দীর্ঘ স্বগতোক্তি নিজের ভারেই দারুণ প্রভাবপূর্ণ; মল্লিকা এবং নন্দের মনের গ্রন্থি এবং ভাবনাচিন্তার খুব স্পষ্ট ছবি এতে পাওয়া যায়, তবুও এতে নাটকের গতি সামান্য শ্লথ হয়। 'আষাঢ় কা একদিন'-এ বিলোমের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কালিদাসের সংলাপ, যদিও সংলাপ রূপেই আছে তবুও নিজের আত্মায়, তা যেন স্বগত। মল্লিকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কালিদাস নিজের মাঝেই ডুবে থাকে। এই দৃষ্টিতে 'আধে অধূরে'র শেষ অংশে সাবিত্রী ও জুনেজার কথাবার্তার মাঝে যে দীর্ঘ সংলাপ পাওয়া যায়, তা যেন বড় বেশী নাটকীয় বলে মনে হয়। যেহেতু এই সব সংলাপ বক্তার নিজের কথা নয়, বরং সামনের লোকেদের বা অন্য কোনো ব্যক্তির কথা বলে, তাই এইসব সংলাপ স্বগতকথন নয়, এবং এই কারণেই এই নাটকের গতি রোধ না হয়ে বরং চরম পরিণতির দিকে কাহিনীকে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়।

এবার এই সব নাটকের আলোচনা পৃথক ভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে করা যাক।

আষাঢ় কা একদিন

'আষাঢ় কা একদিন'-এর বিষয়বস্তু মহাকবি কালিদাসের জীবন সম্পর্কিত। এটা ঐতিহাসিক নাটক নয়, তাই এতে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রকৃত উল্লেখ খোঁজা নিরর্থক। তাছাড়া কালিদাস সম্পর্কে কোন তথ্যই প্রামাণিক নয়। তার সময় কাল, প্রারম্ভিক জীবন, শিক্ষাদীক্ষা, পরবর্তী জীবন সব ব্যাপারেই কিংবদন্তী বেশী প্রচলিত। নিজস্ব কল্পনা এবং ভাবনার মাধ্যমে রাকেশ কালিদাসের জীবন, সাহিত্য এবং মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার যুগ, সমকালীন সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং রাজাশ্রয় ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ

খুবই সংবেদন ও সহানুভূতি-সহ চিত্রিত করেছে। কল্পনার মূল স্রোত কালিদাস হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাচক্র মূলত ঘোরাঘুরি করে তার প্রেয়সী মল্লিকার চারদিকে। নাটকের শুরু হয় 'আষাঢ়ের একদিন' থেকে, যখন অঝোর বৃষ্টিতে সমগ্র প্রকৃতি স্নান করছে। এমন সময়ে বাইরে বৃষ্টির জলে এবং অন্তরে কালিদাসের প্রতি কোমল ভাবনার রসে স্নাত হয়ে মল্লিকা আসে। মা অম্বিকা তার ও কালিদাসের সম্পর্ক নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ। তার দৃষ্টিতে কালিদাস আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি সে কখনও মল্লিকাকে স্বীকার করবে না। তখনই উজ্জয়িনী থেকে রাজপুরুষ কালিদাসকে আমন্ত্রণ করতে আসে। কালিদাস প্রথম প্রথম সেখানে যেতে দ্বিধা বোধ করে, কিন্তু মল্লিকা তাকে পাঠিয়ে দেয়। এরি মাঝে বিলোম সেখানে আসে এবং কালিদাসকে উল্টোপাল্টা কথা শোনায়। সে একজন বাস্তববাদী ব্যক্তি, মল্লিকার প্রতি অনুরক্ত, সেই সঙ্গে অম্বিকার প্রতি সহৃদয়। এক জায়গায় সে বলে—'বিলোম কে? সে হলো অসফল কালিদাস এবং কালিদাস হলো সফল বিলোম।'

সকলের বোঝানোর ফলে কালিদাস চলে যায়। অম্বিকার গৃহ, মন এবং স্বাস্থ্য সবই জর্জর হয়ে ওঠে। মল্লিকাও ভেঙে পড়ে। কয়েকবছর পরে কালিদাস কাশ্মীর থেকে ফেরার সময় ওদিক দিয়ে আসে। ইতিমধ্যে সে রাজপুরুষ হয়ে গেছে, রাজকন্যা প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীকে বিয়ে করেছে, এবং মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত হয়েছে। সে নিজে মল্লিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় না, কিন্তু প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী দেখা করতে আসে। তাকে সে নিজের সঙ্গে করে রাজধানী নিয়ে যাবার, সেই সঙ্গে কোনো রাজঅধিকারীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার প্রস্তাব রাখে। মল্লিকা, অম্বিকা স্তব্ধ হয়ে সেই প্রস্তাব শোনে এবং ভেতরে-ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চুপ থাকে। অম্বিকা যখন কালিদাসের সম্পর্কে ভালমন্দ উচ্চারণ করে, মল্লিকা তখন তাঁকে এই বলে থামিয়ে দেয়, 'ওর সম্পর্কে কিছু বলো না মা, কিছু বলো না, কিছু বলো না।'

সময় পার হয়। ইতিমধ্যে অম্বিকার মৃত্যু ঘটে। অভাবগ্রস্ত মল্লিকা জীবিকার জন্য বারাঙ্গনা হয়, বিলোমের প্রতিও সমর্পিত হয়, একটি কন্যার জন্ম দেয়—সম্ভবত সে বিলোমের ঔরসজাত। তা সত্ত্বেও সে তার 'ভাবনা কক্ষ' শূন্য হতে দেয় না, সেখানে কালিদাস বহাল ছিল, বহাল থাকে। তখন একদিন অকস্মাৎ কালিদাস সশরীরে এসে হাজির—তেমনই আষাঢ়ের একদিন, আবার তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। মল্লিকার প্রতি সে তার আন্তরিক টান ব্যক্ত করে এবং বলে যে, 'আমি যখনই লেখার চেষ্টা করেছি, তোমার ও আমার জীবনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছি। (তৃতীয় অঙ্ক)। সে মল্লিকাকে পুনর্বার স্বীকার করতে রাজী হয়, কিন্তু ভেতর থেকে মল্লিকার শিশুকন্যার কান্নার রোল তাকে বাধা দেয়। অতীত নিয়ে পুনরায় বেঁচে ওঠার কামনাকাঙ্খী কালিদাসকে মল্লিকার বর্তমান ঝাঁকুনি দেয়। তখন সে 'দেখছি সময় খুবই পরাক্রমশালী, কেননা.....সে প্রতীক্ষা করে না..... কখনও প্রতীক্ষা করে না...,' বলতে বলতে চলে যায়। মল্লিকা আবার সেই গুমরে ফুলে ওঠা মেঘের ভেতর তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিলীন হতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

গোটা নাটক একদিকে কোমল ভাবনা এবং সুন্দর কল্পনার মাঝে চলে, অন্যদিকে তিক্ত বাস্তবের চপেটাঘাত খেয়ে চলে। কালিদাস ও মল্লিকার সম্পর্ক প্রথম শ্রেণীর, অবশিষ্ট সব কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর। অম্বিকা, বিলোম, মাতুল, প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী সকলেই প্রাণবন্ত চরিত্র, পরিস্থিতির বিবেচনা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখে। ফলস্বরূপ কালিদাস ও মল্লিকার মাঝে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, এবং 'ভাবনায় ভাবনার বরণকারী মল্লিকাকে মনে হয়, বুঝিবা সে শেষে একেবারে আশ্রয়হীন একা হয়ে পড়ে।

'আষাঢ় কা একদিন'-এ কালিদাস বহুল আলোচনার বিষয়। রাকেশের একথা বলা সত্ত্বেও '.....কালিদাস আমার কাছে শুধু একজন ব্যক্তি নয়, আমার সৃষ্টিশীল শক্তির প্রতীক....', আষাঢ়ের কালিদাসকে আমরা শুধুমাত্র সৃষ্টিশীল শক্তির প্রতীক হিসেবে স্বীকার করতে পারি না। সে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালিদাস। নাটকে বর্ণিত কিছু ঘটনা, তার নতুন নামকরণ 'মাতৃগুপ্ত' ইত্যাদি থেকে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা—যার রচনা কালিদাস করেছিল। যদিও এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার, যে কালিদাসের জীবনের নানান প্রসঙ্গ, মল্লিকা, অম্বিকা, বিলোম ইত্যাদি চরিত্র রাকেশের কল্পনাপ্রসূত, নাকি প্রচলিত কিংবদন্তি? তবুও কালিদাস মহাকবি কালিদাস-ই তাতে কোন সংশয় নেই। সব চেয়ে দুঃখের বিষয়, কালিদাসের সংশয়যুক্ত, আত্মকেন্দ্রিক, দুর্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটা সত্য যে কালিদাস সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য খুবই কম পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় বিশাল এবং বিরাট সাহিত্য রচয়িতা মহাকবিকে এত দুর্বল এবং মেরুদণ্ডহীন দেখানোর কি কোন প্রয়োজন ছিল? প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে কালিদাসকে বোঝা যায়, তাকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে বর্তমানে, বাস্তব থেকে সবসময় চোখ বুজে অতীত নিয়ে বেঁচে থাকার কামনাকাঙ্খী কালিদাস, বা কালিদাসের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারিণী মল্লিকার বাস্তব অবস্থা জানার পর তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে চলে যাওয়া হৃদয়হীন কালিদাস নয়। মনে হয়, প্রেম ও সম্পর্কের উদ্দাম স্বরূপের চিত্রী মহাকাব্য রচয়িতা কালিদাস এতখানি সংকীর্ণমনা হতে পারে না। কালিদাসের চরিত্রের এই দুর্বলতা মল্লিকার সামনে তাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র করে তোলে। নাটক শেষ হবার পর কালিদাস দূরে কোথাও হারিয়ে যায়। চোখের সামনে শুধু ঘুরে বেড়ায় মল্লিকা .....ক্রন্দিত বিলাসী মল্লিকা.....বিধ্বস্তা পরাজিতা মল্লিকা।

আরেকটা বিষয় নিয়ে প্রায় আলোচনা হয়েছে। রাজকীয় সম্মানের ব্যাপার-স্যাপার প্রাচীন যুগের সঙ্গে বেশ মিল আছে, তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় অঙ্কে কালিদাসের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যাপার রঙ্গিনী-সঙ্গিনীকে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বলে মনে করা, অধিকাধিক বস্তু কোন-না-কোন ভাবে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা, এবং অনুস্বার ও অনুনাসিকের মত নিষ্কর্মা কর্মচারিদ্বয়ের গোটা ক্রিয়াকলাপ ও মনোবৃত্তি স্ব-আস্থায় আধুনিক। এই রকম, প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীর গাঁয়ের পরিবেশকে রাজধানীতে পুনর্নির্মিত করার কামনাও আধুনিক। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, রাকেশ এই বর্তমান অবস্থাকে খুবই সুন্দর ভাবে ঐ যুগের জন্য বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপনা করেছে, এবং এই কারণেই 'আষাঢ় কা একদিন' আজকের পাঠক ও দর্শকের মন এতখানি স্পর্শ করে।

শিল্পগতদৃষ্টিতেও 'আষাঢ় কা একদিন' দারুণ স্মার্ট রচনা। একটাই দৃশ্যবন্ধ স্থানের ঐক্য টিকিয়ে রাখে। সময়ের ব্যবধান যদিও বেশ দীর্ঘ, তবে তা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা ঘটনাবলি ক্রমানুসারে এবং বিশ্বস্তভাবে এগিয়ে চলে, দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কের মাঝখানে—এক জোরালো গানের রূপে উপস্থিত। তার মাধ্যমে পরিবেশের স্থূল পরিবর্তন ও মনের সূক্ষ্ম ভাঙন প্রকাশ পায়, যা তৃতীয় অঙ্কে আরও বিকাশ ঘটে। সংলাপ রচনা ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে এটা একটা সবল সৃষ্টি। বাহ্য পরিস্থিতি ও মানসিক অবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই সংলাপ খুব সার্থক ভাবে প্রকাশ করে। মনে হয়, যেন আমরা নাটক না পড়ে একটা কাব্য পাঠ করছি। এই অন্তর্নিহিত কবিত্ব আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। এক একটি শব্দ এবং অভিব্যক্তির ব্যবহার এত ওজন করে করা হয়েছে, যে তাতে কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর তার কোনরকম প্রয়োজনও নাই। সেই সঙ্গে প্রচুর সংলাপহীন মুহূর্ত—যেখানে মৌনভাব, শারীরিক ক্রিয়া, চোখ-মুখের ভঙ্গিমা—বহু কিছু বলার অপেক্ষা রাখে। কালিদাস এবং বিলোম মল্লিকা এবং অম্বিকার কথাবার্তা সার্থক সংলাপের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কালিদাসের আমলের পরিবেশ উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে ভাষা সংস্কৃতনিষ্ঠ, তা সত্ত্বেও তা অর্থবোধক বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। পরিবেশ, অবস্থার বিশ্বস্ততা এবং ভাবের গভীরতা পাঠক ও দর্শকদের সেই আমলে নিয়ে যায়। এই নাটকে মেঘের সুন্দর প্রতীকী ব্যবহার করা হয়েছে। মেঘ হল প্রেমের প্রতীক। নাটকের শুরুতে মল্লিকা মেঘাবৃত আকাশ এবং তুমুল বৃষ্টি প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করে, আর ফিরে আসে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে। প্রথম অঙ্কের সমাপ্তিতে সে বলে—'মা দেখছ, চারদিকে কী ঘন মেঘ ঘিরে ধরেছে। কাল এই মেঘ উজ্জয়িনীর দিকে উড়ে যাবে।' —কাল কালিদাসের উজ্জয়িনী যাবার কথা। তৃতীয় অঙ্ক, আবার সেই আষাঢ়ের একদিন, সেরকমই গর্জনকারী বর্ষণমুখর মেঘ। কালিদাস আসে, তবে ফিরে যাবার জন্য। মল্লিকার অন্তর আবার প্রেমপ্লানিমা করিয়ে মেঘ ফিরে যায়।

লহরোঁ কে রাজহংস

রাকেশের দ্বিতীয় নাট্যকৃতি 'লহরোঁ কে রাজহংস'—১৯৬৩ এর প্রকাশকাল, তবে এর পূর্বভূমিকা অনেক আগেই হয়েছিল। এবং অন্তিম রূপপ্রাপ্তির জন্য একে অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছিল। ১৯৪৬-৪৭ লেখা একটি গল্প 'অনাম ঐতিহাসিক কহানী' তে এর বীজ দেখা যায়। রাকেশ অবশ্য এই কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাকেনি। পরে সে এটাকে সংশোধন-পরিবর্তন করে 'সুন্দরী' নামে একটি শ্রুতিনাটক বা রেডিয়ো নাটক তৈরী করে, যা বোম্বাই থেকে ব্রডকাস্ট হয়েছিল। রাকেশ এতেও সন্তুষ্ট হয় না, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ-আগ্রহে ১৯৫৬-৫৭ এটা পুনরায় লেখে, তবে এবার মঞ্চনাটক বা একাংক রূপে। নতুন নামকরণ হয় 'রাত বীততে তক'। এও প্রসারিত হয় প্রশংসাও পায়, তবুও কিছু ছিল যা এখনও নাটকে ধরা যায়নি এবং যা ধরতে না পারায় রাকেশের মন শান্তি পাচ্ছিল না। ফলস্বরূপ, এতে চিন্তার ক্রিয়া চলতে থাকে। এরি

মাঝে 'আষাঢ় কা একদিন' লেখা হয়, এবং প্রকাশিতও হয়। তার চার-পাঁচ বছর পরে রাকেশ নন্দ-সুন্দরী আখ্যানকে এক নতুন ডাইমেনশান দেয়, নতুন নামকরণ করে এবং ১৯৬৩ সেটাই পূর্ণাঙ্গ নাটক 'লহরোঁ কে রাজহংস' নামে পরিচিত হয়। 'অনাম ঐতিহাসিক কহানী' থেকে 'সুন্দরী' , 'সুন্দরী' থেকে 'রাত বীততে তক' এবং 'রাত বীততে তক' থেকে 'লহরোঁ কে রাজহংস' পর্যন্ত এই যাত্রা মনে হয় শেষাবধি একটা স্ট্যান্ড-এ এসে পৌঁছেছে। তবুও অস্থায়ী স্ট্যান্ড প্রমাণিত হয়।

১৯৬৬ সালে কলকাতার 'অনামিকা' সংস্থার তত্ত্বাবধানে সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক শ্যামানন্দ জালান যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি শুরু করে, নানান প্রশ্ন ও শঙ্কা তার মনে জাগে। বিশেষ করে নাটকের তৃতীয় অঙ্ক নিয়ে, দীর্ঘ পত্র ব্যবহার হয়। নাট্যকার এবং পরিচালক দুজনেই সততার সঙ্গে এক অপরকে বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। স্থির হয় রাকেশ এক মাসের জন্য কলকাতা আসবে, প্রস্তুতি দেখবে, শ্যামানন্দ জালানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তৃতীয় অঙ্কের বিষয় নতুন করে লিখবে, কেননা এই অঙ্কে মূল বিষয় ও ঘটনা যেভাবে এগিয়ে চলেছিল, এবং যে পরিণতিতে পৌঁছেছিল তাতে শ্যামানন্দ সন্তুষ্ট ছিল না। রাকেশ কলকাতা আসে। রোজ রিহার্সালে বসে, তারপর দুজনের সৃজনশীল কথাবার্তা, তর্ক, আলোচনা চলে। প্রতিদিনই রাকেশ কিছু অংশের নতুন রূপ দিত, তার রিহার্সাল হতো। মঞ্চস্থ হবার তিনদিন আগেও জানা ছিল না সমাপ্তি কি হবে। অবশেষে শেষ অংশও লেখা হয় এবং নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটক দেখে মনে হয়, নাটকের প্রথম দুটি অঙ্ক ও তৃতীয় অঙ্কের মাঝে এক বিশেষ ধরনের পার্থক্য ঘটে গেছে। এত বিচার-বিশ্লেষণ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার ফলস্বরূপ তৃতীয় অঙ্ক যেখানে অতি স্মার্ট ও গভীর হয়েছে, সেখানে অতি আধুনিক হয়ে পড়েছে। মনে হয়, যেন আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার ভারতীয় স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে না, বরং বিংশ শতাব্দীর সাত দশকের পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভাবিত আধুনিক দম্পতি পরস্পরের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে যেন বলছে, 'যু দ্য উওম্যান' এবং 'যু দ্য ম্যান।' প্রথম দুই অঙ্কে ঐতিহাসিক মানসিকতা এক বিশাল ধাক্কায় অতি আধুনিক মানসিকতা প্রাপ্ত হয়। প্রয়োজন অনুভব করে, যে নাটকের প্রথম দুই অঙ্কেও কিছু রদবদল করা হোক, যাতে তৃতীয় অঙ্কের জন্য উপযুক্ত পটভূমি তৈরি হয়। ফলে আবার কিছু পরিবর্তন ঘটে। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৬৮ সালে এর অন্তিম রূপ দেয়া হয়। সম্ভবত কোনও নাটকের বীজ অংকুরিত হওয়া এবং পূর্ণরূপে তৈরী হওয়ার সময় ও শক্তির দিক দিয়ে 'লহরোঁ কে রাজহংস' নাটক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমগ্র প্রক্রিয়া সৃষ্টিশীলতা বিকাশ কে বোঝার এবং জীবিত থাকার দৃষ্টিতে অপূর্ব।

অশ্বঘোষের 'সৌন্দর্যানন্দর' উপর আধারিত 'লহরোঁ কে রাজহস' এর বিষয়বস্তু গৌতমবুদ্ধের ভাই নন্দ এবং তার স্ত্রী সুন্দরীকে নিয়ে। ঘটনাস্থল কপিলবস্তু, রাজকুমার নন্দর ভবনে সুন্দরীর শয়নকক্ষ, সময় রাত্রি। নগরে গৌতম বুদ্ধ পদার্পণ করেছেন, এবং সমগ্র শহরবাসী তাঁকে দর্শনের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ

করছে। স্বয়ং দেবী যশোধরা আগামী কাল তাঁর কাছে দীক্ষিত হবেন। নন্দও সেদিকে আকৃষ্ট, তথাপি সে দ্বিধাগ্রস্ত। সুন্দরীকে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুন্দরীও নন্দের মন বুঝতে পারছে, তাকে সে নিজের কাছ থেকে দূরে যেতে দিতে চায় না। নন্দের প্রতি প্রেমের দরুণ সে যতটা এমন করে ভাবছে, তার চেয়ে বেশী ভাবে তার অহংবোধের কারণে। নন্দের ওপর বুদ্ধের প্রভাব তার প্রভাবের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হোক, সে কোন রকমে তা স্বীকার করতে রাজী নয়। ঐ রাতেই সে কামোৎসবের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য, শুধু নন্দই নয় বরং সমগ্র কপিলবস্তুই সেখানে এসে মিলিত হবে, সারারাত যেন নৃত্য ও সুরাপানে নিমজ্জিত থাকে। এই ভাবে নিবৃত্তির ওপর প্রবৃত্তির বিজয় যেন প্রমানিত করবে। নন্দ এই আয়োজন নিয়ে খুবই চিন্তিত।

ভ্রাতা ভগবান বুদ্ধ নগরে উপস্থিত, আগামীকল্য ভ্রাতৃবধূ যশোধরা ভিক্ষুণী হবেন, এই সময় তার এখানে কামোৎসবের আয়োজন হোক— তার এটা ভাল লাগে না, অথচ সুন্দরী কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। নন্দ অবশ্য খুবই প্রয়াস করে, যাতে আয়োজন সফল হয়, অথচ অতিথির আগমন ঘটে না। সে নিজে বুদ্ধের নিকট না গিয়ে থাকতে পারে না। তিনি বলপূর্বক তার কেশ কর্তন করে দেন। নন্দ এর জন্য তৈরী ছিল না, কেননা তার মন পুরোপুরি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জন্য প্রস্তুত নয়। ফেরার সময় সে গর্জনকারী বাঘের সঙ্গে যুঝে পড়ে এবং ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু যে ফিরে আসে, সে আগেকার নন্দ নয়। তার সঙ্গে আসে ভিক্ষু আনন্দ।

কথাবার্তার মাধ্যমে নন্দর দ্বিধাবোধ ও সংশয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তার চলে যাবার পর দীর্ঘ স্বগত-কথনে নন্দ বিগত ঘটনাবলীর পরিচয় দেয়। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, ভোগ এবং ত্যাগ, সুন্দরী এবং বুদ্ধকে নিয়ে তার মনে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা এই প্রসঙ্গেই পাই। তখন সুন্দরী জেগে ওঠে। মুন্ডিত কেশ নন্দকে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে ভয়ঙ্কর আঘাত পায় সে, নন্দ কেশ মুন্ডন করেছে, অর্থাৎ সে সুন্দরীর পূর্ণ প্রভাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মুন্ডিত কেশ নন্দকে সুন্দরী গ্রহণ করতে পারে না, কেননা তার পক্ষে কেশ না-থাকাটা বুদ্ধের প্রভাবের প্রতীক। নন্দ নিজেই অত্যন্ত বিচলিত, দ্বিধাগ্রস্ত। সে গৃহত্যাগ করে রওনা দেয় বুদ্ধের কাছে কিছু প্রশ্ন করতে, যার উত্তর তার চাই। যাবার আগে তার এক স্বগতোক্তি মহত্বপূর্ণ—

> মনে হয় আমি চৌরাস্তায় দাঁড়ানো এক উলঙ্গ ব্যক্তি, যাকে সব দিক গ্রাস করে ফেলতে চায় এবং নিজেকে ঢাকার মতো তার কাছে কোন আচ্ছাদন নেই। কিন্তু.....আমি এই অসহায় অবস্থায় থাকতে পারিনা।....তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন.....এখন আমাকে গিয়ে তাঁকে অনেক অনেক প্রশ্ন করতে হবে। বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে কত শত প্রশ্ন এক সঙ্গে ঘিরে ধরেছে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করেও মনে শান্তি আসেনি....মনে হয় আরও লড়াই করতে হবে, অনেক লড়াই, এমন লোকের সঙ্গে—যার লড়াই করার জন্য বাহু নেই। মনে মৃত্যুর ভয়.....যে কোন ধরণের মৃত্যু.....কিন্তু সেই ভয়ের সঙ্গে একটা আকর্ষণও ছেয়ে রয়েছে। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে আমার চেতনায় একটা প্রশ্ন চিহ্ন.....কেবল একটা প্রশ্নচিহ্ন আছে.....কেন ?....প্রথমেই এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে জানতে হবে.....আজই.....এবং এখনই....।'

(পৃ :৯৭-৯৮ সংস্করণ ১৯৭৩)

নাটকের শেষে শ্যামাঙ্গ মারফৎ জানা যায় নন্দর সংবাদ, সুন্দরীর প্রতিক্রিয়া এবং নেপথ্যে শ্যামাঙ্গের উক্তি (শ্যামাঙ্গ, বস্তুত নন্দের অন্তরাত্মার প্রতীক) নাটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে, মনকে কাঁপিয়ে তোলে। শেষ অংশ উদ্ধৃত করা হল—

নেপথ্যে— না না.....কেউ বুঝতে পারছে না...পাথর...জলে আমি পাথর ছুড়িনি....যে পাথর ছুঁড়েছে....সে ও.....সে ও....সেখানে শুধু তার ছায়া ছিল.....এই অন্ধকারে.....এই অন্ধকার আমি সরাতে পারিনা.....আমায় একটু আলো এনে দাও.....একটু আলো....।

[ইতিমধ্যে সুন্দরী ছায়ামুখ থেকে হাত সরায়]

সুন্দরী—এর চেয়ে বেশী কখনও বুঝতে পারবে না সে.....কখনও বুঝতে পারবে না।

নেপথ্যে—[বিলীয়মান স্বর] শুধু একটু আলো....কেবল একটু আলো....।

এই প্রস্তুতির পর রাকেশ ১৯৬৮ সালে আবার একে পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জিত করে প্রকাশ করে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পটভূমি প্রথম দুটি অঙ্কে নির্মিত হয়। তৃতীয় অঙ্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে। মূল কাহিনীতে নন্দ ও সুন্দরীর মুখোমুখি কথাবার্তা হয় না। কিন্তু ১৯৬৮'র সংস্করণে নন্দ এবং সুন্দরী মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, প্রায় সাত পাতা ধরে তাদের দীর্ঘ কথাবার্তা হয়—যাতে নিঃসঙ্গতা, অসম্পূর্ণতা এবং একে অপরকে বুঝতে না পারার কথা বলা হয়েছে। কথাবার্তার ভঙ্গি ও স্বরূপ বিংশ শতাব্দীর স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার খুব কাছাকাছি। এই কারণেই তা আমাদের মনে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত লাগে। নাটকের সমাপ্তি সুন্দরীর সংলাপে ঘটে, নেপথ্য হতে আসা শ্যামাঙ্গের কথা সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

'লহরোঁ কে রাজহংস' রাকেশের নাটকের মধ্যে বিশেষ মহত্বপূর্ণ। মনের গভীর স্তরে পৌঁছানোর প্রয়াস এই নাটকে করা হয়েছে এবং রাকেশ অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। এর গভীর প্রভাব পড়ত এবং তা অধিক গ্রাহ্য হত। এই নাটকে প্রচুর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বপ্রথম 'লহরোঁ' এবং 'রাজহংস'। লহরে (স্রোত) প্রেম, বাসনা এবং সাংসারিক সুখের প্রতীক এবং তার ওপর সন্তরণরত হংস-মিথুন নন্দ ও সুন্দরী। নাটকের শেষে রাজহংস উড়ে যায়, নন্দও কামনা-বাসনা এবং সুন্দরীর কাছ থেকে দূরে চলে যায়। শ্যামাঙ্গ হল নন্দের অর্ন্তমনের প্রতীক, তার সংলাপের মাধ্যমে আমরা নন্দের অন্তরে ঘটিত অস্থিরতার পরিচয় পাই। বুদ্ধের কাছ থেকে ফেরার পথে নন্দ গর্জনকারী বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া স্বয়ং নিজের

দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতি এবং নিজের সঙ্গে নিজেকে লড়াই করার প্রতীক। স্ব-ক্লান্তিতে মৃত মৃগ স্বয়ং নন্দের প্রতীক! যা অত্যন্ত ক্লান্ত লাগে। সরোবরে বারবার ছায়ার ঘোরাঘুরি বুদ্ধের প্রভাব এবং শ্যামাঙ্গের হাতে অস্থির দড়ি নন্দর জটিল পরিস্থিতির প্রতীক। এ রকম আরও বহু ছোট-ছোট প্রতীকের খুবই সুন্দর প্রয়োগ 'লহরোঁ কে রাজহংস'-এ করা হয়েছে। 'আষাঢ় কা একদিন' যদি কাব্যভাবনার কোমলতায় সমন্বিত হয়ে থাকে, তাহলে 'লহরোঁ কে রাজহংস'-এ কাব্য ও প্রজ্ঞা উভয়েরই সমন্বয় করা হয়েছে।

আধে অধূরে

রাকেশ তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল 'আধে অধূরে'। নারী-পুরুষের সম্পর্কে যে যাত্রা রাকেশ তার গল্পে আরম্ভ করেছিল, এবং যার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ তার নাটকে পাওয়া যায়, তারই চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয় 'আধে অধূরে' নাটকে। এই নাটকে যা কিছু বলার তা সরাসরি বলা হয়েছে, দৃঢ় ভাবে ও নির্ভয়ে। বস্তুত 'আধে অধূরে' নারী-পুরুষের সম্পর্কে কাহিনী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিচ্ছিন্ন হওয়া পরিবারের কাহিনী। পরিবারে পাঁচজন সদস্য—স্বামী, স্ত্রী, বড় মেয়ে, ছেলে এবং ছোট মেয়ে—পরস্পরের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল এবং তিক্ত হয়ে গেছে। তাদের মাঝে কোন রকম আন্তরিকতা বা এক অপরকে বোঝার চেষ্টা নেই, কেবল সাবিত্রী (স্ত্রী) এবং বিন্নী (বড় মেয়ে) ছাড়া। সকলেই যেন এক অপরকে কামড়ে খাওয়ার জন্য উদ্যত। নাটকের বিষয়বস্তু সামান্য, সংক্ষিপ্ত। ঘটনা প্রায় তিন ঘণ্টায় ঘটেছে অথচ বিষয়বস্তু কত দীর্ঘ সময়, কত কিছু জড়ো করা আছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই জানা যায়, গৃহস্বামী মহেন্দ্রনাথ কয়েক বছর ধরে বেকার, গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চাকরি করে, বড় ছেলে অশোক চাকরির খোঁজে, বড় মেয়ে মা-এর বন্ধু মনোজের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এবং যখন-তখন সে শ্বশুর বাড়ি থেকে মায়ের কাছে আসে এটা বলতে যে, 'আমি এখানে আবার একবার খোঁজার চেষ্টা করে দেখি, কি এমন জিনিস এই বাড়িতে আছে, যার জন্য আমায় বারবার হেলা করা হয়।'

ছোট মেয়ে কিন্নী বাড়িতে কারো কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা না পেয়ে এবং দেখা-শোনার অভাবের ফলে দারুণ উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, এমন অনেক কাজ করে ও এমন সব কথা বলে, যা তার করা উচিৎ নয়। পরিবারের এই পাঁচজন ছাড়া কালো স্যুট পরিহিত ব্যক্তি, সিংঘানিয়া, জগমোহন এবং জুনেজা আরও চারটি চরিত্র আছে। কালোস্যুট পরিহিত ব্যক্তি বস্তুত সূত্রধর গোছের, যে শুরুতেই দীর্ঘ সংলাপে নাটকের পটভূমি ব্যক্ত করে, তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় এবং নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। সিংঘানিয়া সাবিত্রীর বস, যার মাধ্যমে রাকেশ মনিব সম্প্রদায়ের বা শোষকের কুৎসিত প্রবৃত্তি, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগের ব্যর্থ বিজ্ঞাপন, অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং অধীনস্ত কর্মরতা মহিলাদের কাছ থেকে অন্যায় লাভ তোলার প্রবৃত্তি কে উপস্থাপিত করেছে।

জগমোহন সাবিত্রীর পুরনো প্রেমিক, অভিজ্ঞ এবং প্র্যাক্টিকাল। সাবিত্রীর আমন্ত্রণে সে অবশ্য আসে, কিন্তু অপ্রয়োজন ভাবুকতায় ভেসে গিয়ে এমন কিছু করার আশ্বাস তাকে দেয় না, যাতে পরে অনাবশ্যক ঝামেলা সৃষ্টি হয়। সে সাবিত্রীর কথা সহানুভূতির সঙ্গে শোনে, তার প্রতি কোমলতা ঝরে পড়ে, তবে সব কিছু ভেবে-চিন্তে দৃঢ়তাসহ। নাটকের চতুর্থ পুরুষ জুনেজা এদের সকলের চেয়ে ভিন্ন। সে মহেন্দ্রনাথের নিকটতম বন্ধু, মহেন্দ্রনাথ যখন-তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে তার কাছেই যায়। গোড়ার দিকে তার প্রতি সাবিত্রীর পর্যাপ্ত আকর্ষণ ছিল, কাঁধে মাথা রেখে সে বহুবার কেঁদেছে। এই পরিবারের কোন কথা তার কাছে লুকনো নেই। সে সকলের বিশ্বাস পেয়েছে। কিন্তু সে স্পষ্টবক্তা, সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখে এবং প্রয়োজন বোধ করলে সে যে কাউকে সরিয়ে দিতে পারে। শেষ দৃশ্যে সে গভীর ধৈর্য ধরে সাবিত্রীর কথা শোনে, তারপর পরিস্থিতি ও তার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে কিছু আর বাকি রাখে না। তাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলে। নাটকে জুনেজা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা চরিত্র, সে সাবিত্রী ও মহেন্দ্রনাথের স্বভাব ও সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে। সাবিত্রীর কিছু বলার থাকে না। দোষ কেবল মহেন্দ্রনাথ বা পরিস্থিতির নয়, সাবিত্রী নিজেই অনেক ব্যাপারে দায়ী—এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

রাকেশ নিজেই জানিয়েছে, কালো স্যুট পরিহিত ব্যক্তি, মহেন্দ্রনাথ, সিংঘানিয়া, জগমোহন এবং জুনেজা পাঁচ ব্যক্তির অভিনয় একজন অভিনেতাকে দিয়ে করা হোক। এই ভাবে নাট্যকার নানান চরিত্রে নিহিত সেই অর্ন্তভুক্ত ঐক্যের পরিচয় দিতে চায় যা সকল পুরুষের মাঝে অনিবার্য রূপে অবস্থিত। এবং যার ফলে সাবিত্রীর কাছে কোনো পুরুষই 'সম্পূর্ণ মানুষ' মনে হয় না, সবই অর্দ্ধেক-অসম্পূর্ণ আধে-অধূরে মনে হয়। শুধু তাই নয়, মূলত সে তার চরিত্রদের নির্দিষ্ট নামও দেয় নি—কালো স্যুট পরিহিত ব্যক্তি, পুরুষ এক, স্ত্রী, বড় মেয়ে, ছেলে, ছোট মেয়ে, পুরুষ দুই, পুরুষ তিন এবং পুরুষ চার। এমনিতে কালো স্যুটপরিহিত ব্যক্তি ছাড়া সকলেরই ব্যক্তিগত নাম আছে—মহেন্দ্রনাথ এবং জুনেজা, তবুও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, বরং আজকের সমাজের পরিস্থিতিবিশেষ এবং আজকের সমাজে বেঁচে থাকা লোকেদের চরিত্র উপস্থিত করা— এ কারণে নাটকের চরিত্র নামবাচক না হয়ে জাতিবাচক হয়েছে। নাটকের গোড়ায় কালো স্যুট পরিহিত ব্যক্তির উক্তি এই তথ্যে আলোকপাত করে—

> 'ব্যাপারটা এই যে, দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে আমি কোন-না-কোন অংশে আপনাদের মধ্য থেকে অংশত ব্যক্তিস্বরূপ, এবং এই একমাত্র কারণ যে নাটকের বাইরে বা ভেতরে আমার কোন নিশ্চিত ভূমিকা নেই, এবং 'এক বিশেষ পরিবার ও তার বিশেষ পরিস্থিতি। পরিবার ভিন্ন হলে, পরিস্থিতিও পালটে যায়, কিন্তু আমি সেই থাকি। এই ভাবে সব কিছু নির্ধারিত হয়। এই পরিবারের নারীর স্থানে অন্য কোন নারী অন্য ভাবে আমাকে সহ্য করত— অথবা সেই নারী আমার ভূমিকা গ্রহণ করত আর আমি তার ভূমিকা নিয়ে তাকে সহ্য করতাম।

> নাটকের শেষ তবুও অনিশ্চিত থেকে যায় এবং এটা নির্ণয় করা বস্তুত কঠিন মনে হয়, যে এতে মুখ্য ভূমিকা কার— আমার, নাকি সেই নারীর, নাকি পরিস্থিতির, কিংবা তিনজনের মাঝে উত্থিত কিছু প্রশ্নের।'

গোটা নাটকের এই নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ আমাদের কাছে অদ্ভুত ভাবে নিজস্ব মনে হয়। মনে হয়, এটা অন্য কারো নয় বরং আমাদেরই কথা বলা হচ্ছে। স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন—নানান রূপে কোথাও-না-কোথাও আমরা নিজেদের ছায়া দেখতে পাই, এবং সেই সব চরিত্রের বা সম্পর্কের কথা আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। 'আধে অধূরে'র মাঝে এটা এক অসাধারণ শক্তি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, সম্পর্কের অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আবরণ। সব কিছু সরিয়ে দিয়ে নাট্যকার অত্যন্ত নির্মম ভাবে তার সৃষ্ট চরিত্রের বাস্তব প্রকাশ করেছে, যা অভিনেতা ও দর্শক দুজনকেই প্রভাবিত করে, বিচলিত করে। মহানগরীয়— বিশেষ করে দিল্লীর জীবনযাত্রা, বেঁচে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধুনিক পরিবারের পরিস্থিতি, সম্পর্ক, পারস্পরিক মনোমালিন্য, মানসিক উদ্বেগ, ত্রাস ইত্যাদির এমন নিপূণ ও বিশ্বস্ত চিত্র সম্ভবত, অন্য কোনো ভারতীয় নাটকে নেই। 'আষাঢ় কা একদিন'-এ কালিদাস এবং 'লহরোঁ কে রাজহংস'-এ নন্দ বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়, কিন্তু দুজনেই ফিরে আসে। সাবিত্রীকে এখন জগমোহন স্বীকার করে না, আর মহেন্দ্রনাথ প্রতি শনি-মঙ্গলবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। মনে হয়, এই পরিবারের সকল চরিত্র—বিশেষত, মহেন্দ্রনাথ এবং সাবিত্রী ভয়ঙ্কর তিক্ততা সত্ত্বেও অভিশপ্ত। তাদের একই ছাদের তলায় থাকতে হয় এবং বাইরে গিয়েও বার বার ফিরে আসতে হয়।

বিষয়বস্তু ও চরিত্র সহ 'আধে অধূরে'র বড় শক্তি হল তার সুগঠিত শিল্প-পক্ষ—ঘটনার সংযোজন, পরিস্থিতির বিকাশ, ভাষার সৌকর্য, এবং সংলাপের স্মার্টনেস। নাটকের গোড়ায় কালো স্যুট পরিহিত ব্যক্তি নাটকের পরিচয় দেয়, অবস্থা-পরিস্থিতি স্পষ্ট ব্যক্ত করে। তারপর, শুরু হয় মূল নাটক। সাবিত্রী অফিস থেকে ফিরে আসে। ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে ওঠে। সেই সময় মহেন্দ্রনাথ আসে, তার ওপর ফেটে পড়ে—বাড়িতে বেকার বসে থেকে আর কিছু না হোক ঘরদোর গুছিয়ে রাখতে পারে। এর মধ্যে ছোট মেয়ে আসে। তাকে বকুনি দেয়। মহেন্দ্রর সঙ্গে তার খিটিমিটি চলতে থাকে, এরি মধ্যে বড় মেয়ে আসে। তার সঙ্গে কথাবার্তার মাঝে এই বাড়ি এবং তার দাম্পত্য জীবনে ফাটলের কথা জানা যায়। তখনি বড় ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। কথা কাটাকাটি আরও তুঙ্গে ওঠে। মহেন্দ্রনাথ রাগে ফেটে পড়ে এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তার চলে যাবার পর সাবিত্রী তার বস সিংঘানিয়াকে আসার জন্য খবর দেয়। অশোকের চাকরি জোটানের উদ্দেশ্যে সে সিংঘানিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অশোক নিজে সেই লোকটার ব্যবহারের জন্য তার ওপর চটে থাকে। সিংঘানিয়া আসে, অশোক তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। সে চলে যাবার পর সাবিত্রী ও অশোকের মাঝে আবার রাগারাগি শুরু হয়। ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে এই বাড়ির কারোর জন্য কিছু করবে না বলে, সাবিত্রী

সিদ্ধান্ত নেয়।

'অন্তরালে'-র পর অশোক আর বিন্নীর কথাবার্তার মাঝে সাবিত্রী অফিসে ফিরে আসে, জগমোহনকে সে চায়ের আমন্ত্রণ করেছে, একথা বিন্নীকে জানায়। এও বলে যে 'পরের বার এলে আমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।' বিন্নী ওকে, 'আরেকটু ভেবে দেখ' বলে চলে যায়।

সাবিত্রী আরেকটু ভাবতে অস্বীকার করে। জগমোহন এলে তার সঙ্গে চলে যায়। এর পর জুনেজা আসে। জুনেজা ও কিন্নীর সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়। যার ফলে, মহেন্দ্র ও সাবিত্রীর সম্পর্কের তিক্ততা আরও মুখর হয়ে ওঠে। ততক্ষণে সাবিত্রী কিন্নীকে সঙ্গে টেনে-হিচড়ে নিয়ে ফিরে আসে। জগমোহনের কাছ থেকে সে কোনো রকম অনুকূল প্রতিক্রিয়া পায় না। বাড়ি ফেরার সময় প্রথমে কিন্নী, তারপর জুনেজার মুখোমুখি হয়। কিন্নীকে বকে-মেরে সে ঘরে বন্ধ করে রাখে, তারপর শুরু হয় জুনেজা ও সাবিত্রীর মাঝে দীর্ঘ কথোকপথন সাবিত্রী, মহেন্দ্রনাথ ও তার বন্ধুদের—যাতে জুনেজাও আছে—তাদের মুখোশ খুলে দেয়। পরে জুনেজাও তাকে ফালা-ফালা করে ছাড়ে। ভয়ঙ্কর টেনশান এবং বিস্ফোরণের মুহূর্ত অবধি কথাবার্তা এগিয়ে যায়, ঠিক তখনই মহেন্দ্রনাথের ফিরে আসার সংবাদ পাওয়া যায়, এবং 'ছেলের হাত ধরা পুরুষের একটি ধোঁয়াটে আকৃতি ভেতরে আসছে দেখা যায়।' এবং 'তারা দুজনে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবহ সংগীত স্পষ্ট ও অন্ধকার গভীর হয়ে ওঠে।' নাটক শেষ।

রাকেশ সমগ্র ঘটনার সমাবেশ অত্যন্ত কুশল ভাবে করেছে। একই ব্যক্তিকে দিয়ে পাঁচজন পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করার নির্দেশ দিয়ে সে এটাই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছে, যে প্রতিটি পুরুষের মাঝে কিছু সামান্য গুণ, কিছু দোষ থাকে। এক জায়গায় সাবিত্রী বলে—সকলেই.....এক ধরনের। একেবারে একই ধরনের আপনারা। আলাদা আলাদা মুখোশ, কিন্তু চেহারা ?.....চেহারা সকলের একই।' স্থূল চেহারাও একই ধরনের হওয়াতে এই সংলাপ আরও সার্থক ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

নাটকের শুরু মানসিকতা উদ্বেগ দিয়ে, এবং শেষও হয় চাপা উত্তেজনা যা অত্যন্ত গভীর ও পীড়াদায়ক। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা সময়ের গোটা ঘটনা এমন স্বাভাবিক, অথচ দ্রুত বিকাশ ঘটে যে নিঃশ্বাস নেয়ার অবকাশ পাওয়া যায় না। সিংঘানিয়া এবং জগমোহনের অংশে উত্তেজনা কম, নইলে গোটা নাটকটাই ভয়ঙ্কর মানসিক উদ্বেগে পূর্ণ। এই সমগ্র উদ্বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা ও যথাযথ জিইয়ে রাখার জন্য রাকেশ-প্রযুক্ত শক্তিশালী ও তীব্র ভাষার গভীর হাত আছে। দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষার এমন শক্তিশালী প্রয়োগ অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য, ওজন করে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও একটা শব্দ পালটানোর প্রয়োজন পড়ে না, একটা বাক্য বাদ দেওয়ার প্রয়োজনও নেই। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা বহুবার বাক্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ করি, অথবা শব্দসমূহ সর্বদা ব্যকরণসম্মত ভাবে না সাজিয়ে সামনে-পেছনে বলে থাকি। 'আধে অধূরে' সংলাপে রাকেশ এই ধরণের ভাষার প্রয়োগ করেছে।

এই প্রবৃত্তি শেষাবধি ভাষার শক্তি হয়ে উঠেছে এবং এতে দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষার অপরিসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দিতে প্রায় সব মহত্বপূর্ণ নাট্যসংস্থা এই নাটক মঞ্চস্থ করেছে, প্রযোজনা সর্বত্র সফল হয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই নাটকের এবং ইংরেজীতে অনুবাদ ও মঞ্চস্থ হয়েছে। রাকেশ কে সর্বভারতীয় নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে 'আধে অধূরে'র মহত্বপূর্ণ অবদান স্বীকার্য।

রাকেশের শেষতম নাটক 'পৈর তলে কী জমীন' নিশ্চিত ভাবে আরেক ধাপ এগিয়ে। এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত সমসাময়িক, তবুও এতে সংলাপ তেমন প্রভাবপূর্ণ নয়, শিল্পও নয়। অবশ্য দেখলে মনে হয় সব কিছু স্মার্ট-দুরস্ত, কিন্তু এর চরিত্রের সঙ্গে আমরা কোথাও নিজেদের একাকার করতে পারি না। ফলে নাটক মনকে তেমন স্পর্শ করে না, মস্তিষ্ককেও না। অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর সময় ব্যক্তির যে মানসিক অবস্থা হতে পারে, তারই বড় হালকা রূপ সামনে হাজির হয়। আধুবের এমন মানসিক অবস্থায় মেয়েদের পেছনে ছোটাছুটি করাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে। সংক্ষেপে বলা যায়, 'আধে অধূরে' নাটকে রাকেশ যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে 'পৈর তলে কী জমীন'-এর সঙ্গে তা খাপ খায় না। বেশ কয়েকটি নাট্যদল যদিও এই নাটক মঞ্চস্থ করেছে, কিন্তু তেমন কোন প্রভাব রেখে যেতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে রাকেশের একাঙ্ক নাটক, বীজ নাটক, পার্শ্বনাটক এবং শ্রুতি নাটকের আলোচনা করা যাক। তার মৃত্যুর পর তার দুটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। প্রথম—'অন্ডে কে ছিলকে, অন্য একাঙ্কী তথা বীজ নাটক' (১৯৭৩) এবং দ্বিতীয় 'রাত বীততে তক তথা অন্য ধ্বনি-নাটক (১৯৭৪)। নামেই স্পষ্ট, প্রথমটায় কয়েকটি একাঙ্ক নাটিকা এবং বীজ-নাটিকা আছে। অন্যটায় ধ্বনি-নাটক অর্থাৎ রেডিয়ো নাটক বা অভিনয় পাঠের জন্য উপযুক্ত নাটক। প্রথম সংগ্রহে পার্শ্বনাটক নামে একটি একাঙ্ক নাটিকা 'ছতরিয়াঁ'ও সঙ্কলিত আছে।

'অন্ডে কে ছিলকে' সংগ্রহের চারটি একাঙ্ক নাটিকা—'অন্ডে কে ছিলকে', 'সিপাহী কী মাঁ', 'প্যালিয়া টুটতী হ্যায়', এবং 'বহুত বড়া সওয়াল', দুটি বীজ নাটিকা, 'শায়দ এবং 'হঃ' এবং একটি পার্শ্বনাটিকা 'ছতরিয়া' সঙ্কলিত আছে। এই সংগ্রহে একাঙ্কী নাটিকার বিষয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের আশেপাশে ঘটিত ছোট বড় ঘটনার প্রকাশ। রাকেশ অতি কুশল ভাবে, গভীর ভাবে চিন্তা করে এই সব একাঙ্ক নাটিকা রচনা করেছে। এই সব নাটিকা প্রায় মঞ্চস্থ হয়েছে।

'বীজ নাটক' এবং 'পার্শ্বনাটক' নাম সম্পর্কে অনেক ব্যাপার স্পষ্ট নয়। শব্দ ও ধ্বনি নিয়ে রাকেশ যে নতুন প্রয়োগ করছিল, তারই অন্তর্গত সে এই একাঙ্ক নাটিকা লেখে এবং তা সাধারণ একাঙ্ক নাটক থেকে আলাদা এক বিশেষ সংজ্ঞা দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কথা-বার্তার অভাব, উদাসীনতা, একে অপরের জন্য কিছু করার ইচ্ছে থাকা সত্বেও কিছু করতে না-পারা, এবং.....'আচ্ছা....কাল আবার কথা বলবো.....দেখো হয়তো....' বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়া, আজকের জীবনে একঘেয়েমিভরা অবস্থার প্রকাশ করে। 'হঃ' নাটিকায় ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ-বয়সে বুড়ো মা-বাবার একা দিন কাটানোর চিত্র আঁকা হয়েছে। এই দুটি বীজ নাটকে সংলাপের সঙ্গে নানাধরনের ধ্বনি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। 'ছতরিয়াঁ' নাটিকা এই প্রয়োগের আরেক ধাপ এগিয়ে। এতে মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রের মুখ তেকে খুব কম সংলাপ বলানো হয়েছে, ছোট-বড় সংলাপ এবং ধ্বনি—পার্শ্ব অর্থাৎ উইংস বা নেপথ্য থেকে বলার বিধান দেওয়া হয়েছে। তারই সাহায্যে আজকের নামহীন, আকারহীন ব্যক্তির পরগাছা হয়ে ওঠা জীবন ও অস্তিত্বের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ হয়েছে, অবশ্য এই পরীক্ষামূলক নাটিকা প্রয়োগ হয়েই থেমে গেছে, বিশেষ কোন প্রভাব রাখতে পারেনি।

'রাত বীততে তক তথা অন্য ধ্বনি নাটক', সংগ্রহে মোট আটটি রচনা সঙ্কলিত 'রাত বীততে তক', 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', 'সুবহ সে পহলে', 'কোঁয়ারী ধরতী', 'উসকী রোটী', 'আষাঢ় কা একদিন', 'দুধ আউর দাঁত', এবং 'আখিরী চট্টান তক।' 'রাত বীততে তক', 'সুবহ সে পহলে', 'কোঁয়ারী ধরতী' এবং 'আঁখিরী চট্টান তক' মূলত' ধ্বনি নাটক। 'রাত বীততে তক' ইতিহাস প্রসিদ্ধ নন্দ এবং সুন্দরীর কাহিনী নিয়ে। পরবর্তীকালে বহু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের পর এটাই 'লহরোঁ কে রাজহংস' নাটক রূপে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। শেষ তিনটি একাঙ্কিকা আমাদের সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। 'আষাঢ় কা একদিন' এই নামে রেডিয়ো নাটক রূপান্তকরণ, সম্প্রসারিত হয়েছিল। মূল নাটক থেকে খুব অল্প তফাৎ আছে। এটা একটা প্রভাবপূর্ণ শক্তিশালী রচনা। 'উসকী রোটী'—এই নামে রাকেশের কাহিনীর ধ্বনি-রূপান্তর হয়, যা অবলম্বন করে পরে ফ্লিম তৈরী হয়। 'আখিরী চট্টান তক' রাকেশের এই নামের ভ্রমণস্মৃতি গ্রন্থের ধ্বনি-রূপান্তর। ধ্বনিসমূহের প্রচুর ব্যবহার এবং কিছু সংলাপের মাধ্যমে বোম্বাই থেকে কন্যাকুমারী অবধি ভ্রমণের চিত্র এতে পাওয়া যায়। নাটকীয় দৃষ্টি থেকে এটা কতদূর সফল, তা বলা শক্ত। 'স্বপ্নবাসবদত্তম' মহাকবি ভাসের নাটক, যা বসন্ত বাপট কৃত সংস্কৃত বেতার নাটকের হিন্দি অনুবাদ।

নাটকের ক্ষেত্রে রাকেশের অবদান সংখ্যায় খুব বেশী নয়, কিন্তু গুণগত দৃষ্টিতে তা শ্রেষ্ট ও মহত্বপূর্ণ। জয়শংকর প্রসাদের নাটক প্রসঙ্গে 'সাহিত্যিক নাটক' এবং 'রঙ্গমঞ্চীয় নাটক' বলে নাট্যরচনার অপরিহার্য অভিনয় মঞ্চের সঙ্গে সাহিত্যিকের যে বিরোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রাকেশের নাটক তা উন্মূলন করেছে। তার নাটক সাহিত্য আধারিত এবং নাট্যমঞ্চ প্রভাবিত। বিষয়বস্তু কাহিনী সংযোজন, দৃশ্য সংলাপ, ভাষা, রঙ, ইত্যাদি সকল দৃষ্টিতে রাকেশের সৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর এবং তা নাট্যমঞ্চের অনুকূল। অল্প বয়সে তার মৃত্যু না হলে আমরা আরো অনেক নতুন এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি পেতাম।

কাহিনী, উপন্যাস এবং নাটক (যার অর্ন্তগত পুর্নাঙ্গ নাটক, একাঙ্কিকা, বীজ নাটক, ধ্বনি নাটক, এবং পার্শ্বনাটকও সম্মিলিত) ছাড়া অতিরিক্ত রাকেশ কয়েকটা প্রবন্ধ

লিখেছে, জীবনী লিখেছে, পত্রিকায় নিয়মিত স্তম্ভ লিখেছে, শিশুদের জন্য বই এবং ডায়রী লিখেছে। কয়েকটি তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটি পরে। এগুলি হলো—'পরিবেশ' (১৯৭২) 'মোহন রাকেশ সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টি (১৯৭২), 'বকলম খুদ (১৯৭৪) 'সময় সারথী' (১৯৭২) 'বিনা হাড় মাংস কা আদমী' (১৯৭৪) এবং 'মোহন রাকেশ কী ডায়রী' (১৯৮৫)

প্রথম দুটি সংগ্রহ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রাকেশের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রবন্ধের সংকলন। এতে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমকালীন সাহিত্য, নতুন কাহিনী, রঙ্গমঞ্চ সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও তার সমস্যা, ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ভ্রমণ সম্পর্কিত বিবরণ, পন্ত এবং তুলসীদাসের ওপর সমালোচনা প্রবন্ধ, তাছাড়া কয়েকটি মহত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ও আলোচনা সংকলিত হয়েছে। এই সকল রচনার মারফৎ সাহিত্যের প্রতি রাকেশের দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্যিকের প্রতিবদ্ধতা, নতুন গল্পের স্বরূপ ও বিকাশ, আধুনিকতা, ইত্যাদি নানান বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। রাকেশের দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল, সে যা বলতে চাইত তা ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে না বলে সরাসরি এবং প্রভাবপূর্ণ ভঙ্গিতে বলার ক্ষমতা সে রাখত। 'পরিবেশে' চীটিয়োঁ কী পংক্তিয়া: জমীন সে কাগজ তক' শিরোনামায় একটা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে যাতে তার পারিবারিক পটভূমি এবং সংঘর্ষ সম্পর্কে জানা যায়। রাকেশ সম্পাদিত 'আইনে কে সামনে' (১৯৬৫) পুস্তকেও এটি সংকলিত হয়েছে।

'নঈ কহানিয়াঁ' পত্রিকায় রাকেশ ১৯৬০ থেকে ৬৩ সাল অবধি 'বকলম খুদ' শিরোনামায় স্তম্ভ লিখেছে। সারিকায় ১৯৬৪ সালে 'নঈ নিগাহোঁ কে সওয়াল' এবং ১৯৬৭ সালে 'কুছ আওর অস্বীকার' ইত্যাদি শীর্ষক স্তম্ভের অন্তর্গত সে লিখেছে। 'বকলম খুদ' গ্রন্থে 'নঈ কাহানিয়াঁ' এবং 'সারিকা'য় প্রকাশিত তার উপরোক্ত রচনাবলী সংকলিত। যুগপ্রবর্তনের চিন্তা, বিন্দুহীন আলোচনা, হিন্দি নৈতিকতা, প্রশ্নের মুখোমুখি, মাধ্যমের খোঁজে, আজকের সংলাপহীনতা, সময় থেকে বিচ্ছিন্ন সমকালীনতা, প্রভৃতি 'শীর্ষকে'র অন্তর্গত সে অনেক সমকালীন আলোচিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রকাশ করেছে। এই সব প্রবন্ধ শুধু যে রাকেশকে বোঝার জন্য—তা নয়, বরং তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য এবং সাহিত্যিক পরিবেশকে বোঝার জন্য উপযোগী।

'আখিরী চট্টান তক' (১৯৫৩) রাকেশের ভ্রমণ, স্মৃতিচারণার গ্রন্থ। পশ্চিমীতটের ধারে ধারে এক দীর্ঘ যাত্রা করার বাসনা রাকেশ একবার রূপ দেয়। বোম্বাই থেকে পুণা, গোয়া, ত্রিবান্দ্রাম ইত্যাদি হয়ে কন্যাকুমারী ভ্রমণ করে। ভ্রমণে যাতায়াতের বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে, নানান পরিস্থিতিতে কাটায়, নানান লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, এইসবের আকর্ষনীয় বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'সময় সারথী' বিগত আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন বারোজন মহান ব্যক্তির জীবনী সংগ্রহ। রাকেশ নিজে পুস্তকে 'দো শব্দ' অন্তর্গতে লিখেছে—

"এই সংকলনে বর্ণিত জীবনীসকল কয়েকজন ব্যক্তির ইতিহাসমাত্র নয়,

বিগত আড়াই হাজার বৎসরের বিশেষ মানসিকতার এক ধরণের ইতিহাস। সুদূর অতীতে গৌতম বুদ্ধের মনে উত্থিত প্রশ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যা পর্যন্ত কোথাও এক ধারাবাহিকতা আছে, যা এখানে যুক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে। ভারতীয় মানসিকতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি সময়ের সমান্তরাল বিশ্ব মানসিকতাও পাঠ সম্ভব হতে পারে, তার জন্য প্রতিখণ্ডে দুটি ভারতীয় জীবনীর সঙ্গে একটি জীবনী বিদেশ থেকে গৃহীত হয়েছে।"

গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, অশোক, জোয়ান অফ আর্ক, কবীর, মীরাবাঈ, স্বামী দয়ানন্দ, ভগৎ সিংহ, ভলতেয়ার, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং মার্টিন লুথার কিং প্রভৃতি বারোজন মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাকেশ খুবই সহৃদয়পূর্বক লিখেছে। এই লেখা ছোট বড় সকল বয়সী পাঠকের জন্য দারুণ পাঠ্য ও আকর্ষনীয়। 'বিনা হাড়-মাংস কা আদমী' শিশুদের জন্য লেখা আরেকটি বই।

সব শেষে আলোচনা করব 'মোহন রাকেশ কী ডায়রী' নিয়ে। যদিও রাকেশ অনেক আগে থেকে ডায়রী লেখা শুরু করেছিল, তবুও সে কখনও নিয়মিত ডায়রী লিখত না। কেবল দিন নয়, মাস নয়, বছরের ব্যবধানও ঘটেছে। ডায়রী ছাপা হবে, নাকি হবে না, ছাপা হলে কতটুকু দেয়া যায় এবং বাকীটা রেখে দেয়া হবে, নাকি ফেলে দেওয়া হবে, ইত্যাদি প্রশ্ন তার মনে জাগত। তার জীবনকালে ডায়রী ছাপা হয়নি। তার মৃত্যুর অনতিকাল পরেও ছাপা হয়নি। ছাপা হলো তার মৃত্যুর বারো বছর পর ১৯৮৫ সালে। প্রকাশিত ডায়রী শুরু হয়েছে ১৯৪৮ সালে, এবং শেষ লেখা মে ১৯৬৮ সালে। এতে দৈনিক দিনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশে লোকেদের এবং ঘটনাবলির বর্ণনা করা হয়েছে। তার পুরুষবন্ধু নারী বন্ধু এবং প্রেমিকাদের সম্পর্কে রাকেশ খোলাখুলি লিখেছে। অবশ্য সম্পূর্ণ নাম লেখেনি, কেবল নামের প্রথম অক্ষরের উল্লেখ করেছে। কয়েকটি জায়গায় তার প্রতিক্রিয়া, লোকের ভাল বা মন্দ হওয়ার ব্যাপার বেশ খোলাখুলি ভাবেই বলেছে।

ডায়রী লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় দেয়। বিশ্বস্ত ভাবে লেখা ডায়রী আয়নার মত, যাতে ব্যক্তির সব কিছু প্রতিবিম্বিত থাকে, কিছু আর লুকনো থাকে না। রাকেশের অন্তরঙ্গ রূপ ডায়রীতে ফুটে উঠেছে, তবুও একটা ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে, গোটা ডায়রীতে লেখাপড়ার উল্লেখ অপেক্ষাকৃত খুব কম। যাও বা হয়েছে, তা না হওয়ার মত। রাকেশ কি কিছুই পড়ে নি? বা, যা পড়েছে তার সম্পর্কে কি মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি? যদি হতো, তাহলে কি ব্যক্ত করার ইচ্ছা হতো না? ডায়রী পড়ে মনেই হয় না, এটা কোনো মহত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের ডায়রী। বড়জোর জনৈক সংবেদনশীল ব্যক্তির ডায়রী হতে পারে। এতে মুখ্যত ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং প্রেম সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। এতে কিন্তু গভীর হতাশা জাগে। এই ডায়রী থেকে রাকেশের লিখন-প্রক্রিয়া, তার লেখার অভ্যাস, তর সৃজন বিকাশ ইত্যাদির পরিচয় প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না।

এই সব মৌলিক রচনার সঙ্গে সঙ্গে রাকেশ সংস্কৃত এবং ইংরেজী থেকে প্রচুর অনুবাদ করেছে। সংস্কৃত থেকে অনূদিত রচনার মধ্যে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র অনুবাদ 'শাকুন্তল' এবং শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' এর অনুবাদ উল্লেখনীয়। তার আধুনিক ভাবনাবোধে রাকেশ এই অনুবাদগুলি সামকালীন যুগোপযোগী করার প্রয়াস করেছে। ইংরেজী থেকে অনূদিত উপন্যাসের মধ্যে হেনরী জেমস্ এর 'দ্য পোর্ট্রেট অফ এ লেডী'র অনুবাদ 'এক আওরত কা চেহ্‌রা', গ্রাহাম গ্রীণের উপন্যাস 'দ্য এন্ড অফ দ্য এফেয়র' এর অনুবাদ 'উস রাতকে বাদ' এবং এডিটা মরিস-এর উপন্যাস 'ফ্লাওয়ার্স অফ হিরোশিমা'র অনুবাদ 'হিরোশিমা কে ফুল' উল্লেখনীয়। অবশ্য উপন্যাসের অনুবাদ মুখ্যত অর্থোপার্জনের দৃষ্টিতে করা হয়েছে। তাছাড়া বহু পুস্তকের সম্পাদনাও করেছে সে।

রাকেশের বহু রচনার অনুবাদ অন্য ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষার হয়েছে, বিশেষত নাটক। সেসম্পর্কে যদিও সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি। রাকেশের ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে বহু গ্রন্থ তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে কয়েকটি তার ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয় রয়েছে এবং কয়েটি তার কৃতিত্বের বিশ্লেষণ। মার্চ ১৯৭৩ 'সারিকায়' 'মোহন রাকেশ স্মৃতি অঙ্কে' রাকেশের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। 'নটরঙ্গ'-এ প্রকাশিত ২১ সংখ্যার নেমিচন্দ্র জৈন-এর লেখা, 'ইন্যাক্ট'-এ ৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রাজিন্দর পালের লেখা, ইব্রাহিম অলকাজী এবং সুরেশ অবস্থী সম্পাদিত 'আজ কে রঙ্গ' নাটকের ভূমিকা ইত্যাদিতে রাকেশের মূল্যায়নের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। রাকেশের নাটক—বিশেষত 'আষাঢ় কা একদিন' এবং 'আধে অধূরে' ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়েছে, হিন্দির সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিচালকেরা এই নাটকের সার্থক ও সফল প্রযোজনা করেছে, এখনও করছে। গত পঁচিশ বছরে সর্বভারতীয় স্তরে যে সব নাট্যকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাদের মধ্যে রাকেশের স্থান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট : এক

মোহন রাকেশের রচনা

গল্পসংগ্রহ :

ইনসান কে খন্ডহর	(প্রগতি প্রকাশন, দিল্লী ১৯৫০)
নয়ে বাদল	(ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৫৭)
জানবর আউর জানবর	(রাজকমল, ১৯৫৮)
পাঁচ লম্বী কহানিয়াঁ	(রাজকমল, ১৯৬০)
এক আউর জিন্দগী	(রাজপাল, ১৯৬১)
ফৌলাদ কা আকাশ	(অক্ষর প্রকাশন, দিল্লী ১৯৬৬)
সুহাগিনেঁ	(হিন্দ পাকেট বুকস্, ১৯৬৬)
আজ কে সায়ে	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৬৭)
রোঁয়ে-রেশে	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৬৮)
এক-এক দুনিয়া	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৬৮)
মিলে-জুলে চেহরে	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৬৯)
মেরী প্রিয় কহানিয়াঁ	(রাজপাল, ১৯৭১)
কোয়ার্টার	(রাজপাল, ১৯৭২)
ওয়ারিস	(রাজপাল, ১৯৭২)
পহচান	(রাজপাল, ১৯৭২)
সম্পূর্ণ কহানী সংগ্রহ	(রাজপাল, ১৯৮৪)

উপন্যাস

অন্ধেরে বন্ধ কমরে	(রাজকমল, ১৯৬১)
ন আনেওয়ালা কল	(রাজপাল, ১৯৬৮)
অন্তরাল	(রাজকমল, ১৯৭২)

নাটক

আষাঢ় কা একদিন	(রাজপাল, ১৯৫৯)
লহরোঁ কে রাজহংস	(রাজকমল, ১৯৬৩)
আধে অধূরে	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৬৯)
পৈর তলে কী জমীন	(রাজপাল, ১৯৭৫)

একাঙ্কিকা

অন্ডে কা ছিলকা, অন্য একাঙ্কী তথা বীজ নাটক	(রাধাকৃষ্ণ ১৯৭৩)
রাত বীতনে তক তথা অন্য ধ্বনি নাটক	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭৪)

ভ্রমণ কাহিনী

আখিরী চট্টান তক	(প্রগতি প্রকাশন, ১৯৫৩)

নিবন্ধ/আলেখ

পরিবেশ	(ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৬৭)
সময় সারথী (জীবনী)	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭২)
সাহিত্যিক আউর সাংস্কৃতিক দৃষ্টি	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭৫)

ডায়রী : আত্মকথা

বকলম খুদ	(রাজপাল, ১৯৭৪)
মোহন রাকেশ কী ডায়রী	(রাজপাল, ১৯৮৫)

অন্যান্য

বিনা হাড় মাংস কা আদমী	
অ্যান অ্যানথোলজী (আধে অধূরে, আইনে কে সামনে, তেরহ কহানিয়াঁ আউর এক সাক্ষাৎকার কা অংগ্রেজী অনুবাদ)	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭৪)
রঙ্গমঞ্চ আউর শব্দ (প্রবন্ধ)	(রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭৪)
শব্দ আউর ধ্বনি (প্রবন্ধ)	'ইন্যাক্ট' সংখ্যা ২

অনুবাদ (মোহন রাকেশ কৃত) :

মৃচ্ছকটিক	শূদ্রক
শাকুন্তল	কালিদাস
এক আউরত কা চেহারা	The Portrait of a lady by Henery James
উস রাত কে বাদ	The End of the Affair by Graham Green
হিরোশিমা কে ফুল	Flowers of Hiroshima by Edita Morris

পরিশিষ্ট : দুই

রাকেশ সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং রচনা

গ্রন্থ :

চন্দ সতরেঁ আউর	অনীতা রাকেশ (রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭৫)
মেরা হমদম মেরা দোস্ত	(সঃ) কমলেশ্বর (ন্যাশনাল, ১৯৭৫)
আধুনিকতা আউর মোহন রাকেশ	উর্মিলা মিশ্র (বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, বারানসী)
কহানীকার মোহন রাকেশ	সুষমা অগ্রবাল (পঞ্চশীল প্রকাশন, জয়পুর ১৯৭৯)
উপন্যাসকার মোহন রাকেশ	বিমলা কুমারী পণ্ডিতা (পঞ্চশীল প্রকাশন, জয়পুর ১৯৭৮)
স্বতন্ত্রোত্তর হিন্দি নাটক : মোহন রাকেশ কে বিশেষ সন্দর্ভমে	রীতা কুমার (বিভু প্রকাশন সাহিবাবাদ)
আধুনিক নাটক কা মসীহা	গোবিন্দ চাতক (ইন্দ্রপ্রস্থ প্রকাশন, দিল্লী ১৯৭৫)
মোহন রাকেশ কী রঙ্গসৃষ্টি	জগদীশ শর্মা (রাধাকৃষ্ণ ১৯৭৫)
লহরোঁ কে রাজহংস : বিবিধ আয়াম	জয়দেব তনেজা (তক্ষশিলা প্রকাশন নিউদিল্লী দ্বি সং ১৯৭৭)
নাটককার মোহন রাকেশ	জ্ঞান প্রকাশ জোশী
নাটককার মোহন রাকেশ	(সঃ) সুন্দরলাল কথুরিয়া
অপনে নাটকো কে দায়রে মেঁ নাটককার মোহন রাকেশ	তিলক রাম শর্মা (আর্য বুক ডিপো, নিউদিল্লী ১৯৭৬)
লহরোঁ কে রাজহংস : সমীক্ষা	রাজেশ শর্মা
আধে অধূরে : সমীক্ষা	রাজেশ শর্মা
আধুনিক হিন্দী নাটক আউর নাটাকার	রাম কুমার গুপ্ত
মোহন রাকেশ : ব্যক্তিত্ব আউর কৃতিত্ব	সুষমা অগ্রবাল

বিশেষ সংকলন

মোহন রাকেশ কী স্মৃতি কো সমর্পিত নটরঙ্গ অংক ২১ মে প্রকাশিত লেখ	(সঃ) নেমিচন্দ্র জৈন
মোহন রাকেশ কী স্মৃতি কো সমর্পিত ইন্যাক্ট কা সংযুক্তাঙ্ক ৭৩-৭৪	(সঃ) রাজিন্দর পাল
সুরেশ অবস্থী লিখিত 'আজ কে রঙ্গ নাটক কী ভূমিকা'	(সঃ) ইব্রাহিম অলকাজী পু. ল. দেশপান্ডে তথা সুরেশ অবস্থী
সারিকা : মোহন রাকেশ স্মৃতি অঙ্ক (মার্চ ১৯৭৩)	